KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর হোসেন
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 46/7 46/8 46/9 46/10	Year of Publication : Nov 1985 Dec 1985 Jan 1986 Feb 1986
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No : KLMLG

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

১৯৮৬
ফেব্রুয়ারি

মার্কসবাদে বিশ্বাসী যে ভারতীয় দল সরকারবিরোধী অবস্থান থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারি মূলধনের প্রভাব খর্ব করতে চায়, বহুজাতিক মূলধনের প্রবেশ বন্ধ করতে চায়, সেই দলই যদি ক্ষমতাসীন হয়ে বেসরকারি তথা বহুজাতিক মূলধনের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে অগ্রসর হয়, তাহলে কি মার্কসবাদের মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে? সম্প্রতিকালের এই প্রবল-বিতর্কিত প্রসঙ্গে প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড. ভবতোষ দত্তের বিশ্লেষণ : **'পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ'।**

কংগ্রেস রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধীপর্বই সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবল এবং সচল। অথচ, ভারতের স্বাধীনতালগ্ন যখন সমাসন্ন তখন গান্ধীজী কংগ্রেসের এক নিঃসঙ্গ, প্রকাশ্যে উপেক্ষিত নায়ক। এই ট্র্যাজিক পরিণতির বীজ কি তাঁর কর্মপ্রণালীর মধ্যেই ছিল? উত্তর-সাতচল্লিশ কংগ্রেসের যেসব প্রকট দুর্বলতা, নৈতিক সংকট—তারও উৎস কি এই কর্মপ্রণালী আর নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের মধ্যেই নিহিত ছিল? অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের **'কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন'** প্রবন্ধে এইসব প্রশ্নের উত্তরসন্ধান।

কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিতর্ক-জাগানো প্রবন্ধ।

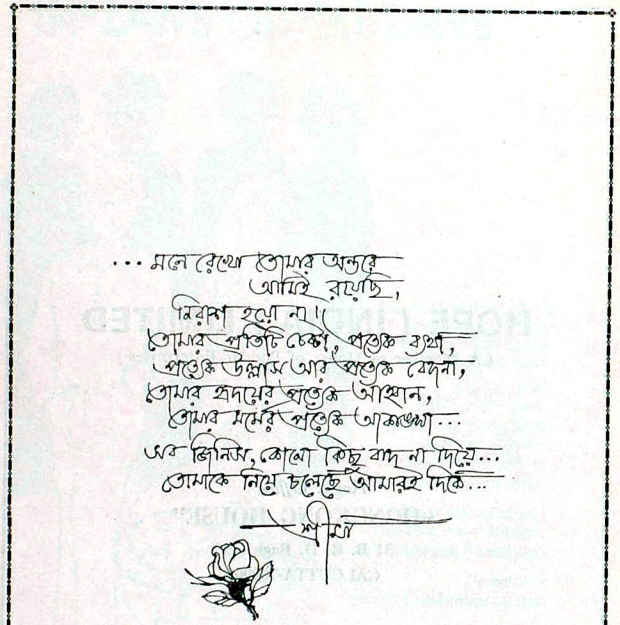

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ১০
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
মাঘ ১৩৯২

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ ভবতোষ দত্ত ৮০১
জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৮২৩
চ্যালেনজ অব এডুকেশন—শিক্ষানীতির একটি প্রেক্ষিত সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৮৩৪
লেভ তলস্তোয়ের জীবন, সাধনা, রচনা অন্নদাশঙ্কর রায় ৮৫৫

নীল সাবানের প্রেম খোন্দকার আশরাফ হোসেন ৮০৭
কম্পোজিটর সাজিয়ে রাখে শব্দ ইকবাল আজিজ ৮০৮
ভোরের বাতাসে শিহাব সরকার ৮০৯
কবিতার নায়ক খালেদা এদিব চৌধুরি ৮১০

গাহে অচিন পাখি ইমদাদুল হক মিলন ৮১১
পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৮২৮
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৮৪৪

গ্রন্থসমালোচনা ৮৬০
জীবনবল্লভ চৌধুরী, বারিদবরণ ঘোষ, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়,
রাধাপ্রসাদ ঘোষাল, বিজিতকুমার দত্ত

আলোচনা ৮৭১
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নানা প্রসঙ্গ ৮৭৫
রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ণালী দাস

মতামত ৮৭৮
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মুখপাতের ছবি ঃ মুকুল দে
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন ঃ ২৭-৬৩২৭

বাংলা বই-এর খবর—১

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক, সত্যিকার গল্প—

একবার আচার্য প্রমথ চৌধুরীকে ঘিরে মিলিত হয়েছেন তখনকার সব মহারথী সাহিত্যিকগণ। আর সেই সঙ্গে আছেন একজন তরুণ। একসময় আচার্য চৌধুরী বললেন, "আকবর বাদশার দরবারে একবার এক গুণী এলেন। তিনি এমন গান শোনালেন যে বড় বড় ওস্তাদরা শির থেকে শিরোপা খুলে তাঁর দিকে ফেলে দিলেন। বাদশা জানতে চাইলেন—'ব্যাপার কী?" তাঁরা নিবেদন করলেন—'জাঁহাপনা, এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব'।"

উপস্থিত মহারথী সাহিত্যিকগণ জিজ্ঞাসু চোখে আচার্য চৌধুরীর দিকে তাকালেন। তখন আচার্য চৌধুরী সেই তরুণের দিকে চেয়ে বললেন, "এখন থেকে তুমিই লিখবে, আমরা পড়ব।" সেদিনের সেই তরুণের নাম অন্নদাশঙ্কর রায়।

বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। একদিকে অতি দুঃসাহসিক ভাবুকতা, অন্যদিকে সার্বভৌম রচনা-শৈলী—এই দুইয়ের অন্যন্য বিবাহে তিনি পুরোহিত।

অন্নদাশঙ্কর একমাত্র বাঙালী উপন্যাসিক যাঁর রচনাতে ধ্যানসিদ্ধ কল্পনার সঙ্গে আশ্রাবণ ঘটেছে প্রজ্ঞা ও বৈদগ্ধ্যের। কেবল কথা আর কথা জুড়ে তাঁর উপন্যাস নয়, তাতে আছে জীবনজিজ্ঞাসুদের জন্যে পথের নিশানা। ইদানীং বাংলা সাহিত্যে ভূগোলের অনেক বৈচিত্র্য এসেছে বটে, কিন্তু তা নিতান্ত বাহ্য। বিংশশতাব্দীর মানস বৈচিত্র্যকে তিনি ধরে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে।

এবং বাঙালী পাঠকসমাজের কাছে অন্নদাশঙ্করের মতো বড় দাবি আধুনিকদের মধ্যে আর কেউ করেছেন বলে জানি না। পাঠকের কাছে তাঁর দাবি—সংস্কার-মুক্ত মনন, উন্নত ও সূক্ষ্ম রুচি, জীবনের গূঢ়তর তাৎপর্য সম্বন্ধে আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা, মহৎ উপলব্ধির জন্য সাধনা।

যেহেতু বাঙালী পাঠকসমাজের মনন, রুচি, আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী তাই পাঠকের সকাশে এই সবগুলি অতি অনায়াসেই দাবি করতে পেরেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
উপন্যাস
ক্রান্তদর্শী (৩ খণ্ড)
৯০.০০
না ৩.০০
তৃষ্ণার জল ৬.০০
রাজ অতিথি ৭.০০

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন: ৩৪ ১০৬৬

শিল্পী : মুকুল দে

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ

ভবতোষ দত্ত

সরকারি ও বেসরকারি মালিকানায় যৌথ উদ্যোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে বিতর্ক উত্তাল হয়ে উঠেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু ভারত সরকার যৌথ উদ্যোগের নীতি স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছেন প্রায় এক দশক আগে। ভারত সরকারের বর্তমান নীতি বেসরকারি উদ্যোগের সহায়ক, এবং সেই নীতিরই অন্যতম পর্যায়ে যৌথ প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার যুক্তি সহজেই মিলে যায়। সরকারি উদ্যোগে বহু ক্ষেত্রে অক্ষম পরিচালনের এবং আর্থিক ক্ষতির অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে অবস্থায় যদি সরকারি উদ্যোগ এবং বেসরকারি পরিচালনাকে একীভূত করা যায় তাহলে সেটাকে "মিশ্র-অর্থনীতি"-রই এক ধরনের প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া যায়। যৌথ উদ্যোগের নীতি গ্রহণ করার ফলে বিদেশী মূলধন এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এদিকে এগিয়ে আসছে। বর্তমান ভারত সরকার বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে আগের মতো কড়াকড়ি করছেন না। মূলত ভারত সরকারের আর্থিক নীতি—যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে মার্চ মাসের বাজেটে, এপ্রিল মাসের আমদানি-রপ্তানি নীতিতে, শিল্প ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণে, এবং ডিসেমবর মাসের দীর্ঘমেয়াদি রাজস্বনীতিতে—সমাজতন্ত্রের পথ থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে দক্ষিণায়িত হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে বিভ্রান্তি, মতভেদ তথা বিতর্কের প্রধান কারণ—এই রাজ্যের সরকার বামপন্থী। এই বামপন্থী সরকার প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় নীতির দক্ষিণায়নের তীব্র সমালোচনা করেছেন, এবং বিশেষ করে বিদেশী এবং বহুজাতিক মূলধনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। অনাবাসিক ভারতীয় মূলধনের নিয়োগেও তাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু এই সরকারই আবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ভারত সরকারের কাছে ওকালতি করেছেন, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে—যেমন ইলেকট্রনিকস—বেসরকারি মালিকদের সঙ্গে যৌথভাবে শিল্পবিনিয়োগে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতি সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গের এই যৌথ বিনিয়োগ নীতি বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে হলদিয়াতে 'পেট্রোকেমিক্যাল' শিল্প স্থাপনের একটি বিরাট উদ্যোগ কার্যকর করবার পথে অগ্রসর হওয়াতে। আপত্তি উঠেছে বামপন্থী সরকার বেসরকারি শিল্পপতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে ; আপত্তি উঠেছে কেন্দ্রের যে নীতি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে রাজ্যসরকার মনে করেন, সে নীতি তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে নিজেরাই গ্রহণ করেছেন বলে। রাজ্যসরকার উত্তরে বলছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, কর্মসংস্থান ইত্যাদিকে অগ্রগতির পথে নিতে হলে তাঁদের আর কোনো বিকল্প কর্মপন্থা নেই।

তাঁদের কর্মপন্থার সপক্ষে রাজ্য সরকারকে বাধ্য হয়েই অনেক কথা বলতে হয়েছে। এত কথা বলার প্রয়োজন থেকেই প্রমাণ হয় যে তাঁদের মনে একটা অপরাধবোধ আছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে নিষ্কলুষ তাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান অবস্থার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত অন্তর্বিরোধ আছে। এই সরকার নিজেরা বামপন্থী, এঁদের সবচেয়ে বড়ো অংশীদার মার্কসবাদী, অথচ এঁদের কাজ করতে হচ্ছে সংবিধানের নিয়ম অনুসারে এবং একটি সম্পূর্ণ অ-মার্কসীয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। এই অধীনতা সংবিধানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যে অর্থে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা বা অস্ট্রেলিয়াকে 'ফেডারেশন' বলা হয়, সে অর্থে ভারত বিপরীত দিকে কেন্দ্রীভূত। আর্থিক নীতির অনেকটাই কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুসারে পরিচালিত হয়। শুধু মুদ্রা, ব্যাঙ্ক বা বিনিময়ব্যবস্থা নয়, শিল্পনীতিও প্রায় পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রের অধিকারে।

দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বামপন্থী রাজ্য সরকার চালাতে হলে বহু ক্ষেত্রে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাতে—অর্থাৎ যতদিন কেন্দ্রীয় সরকার বামপন্থীদের হাতে না আসছে—যে-কোনো বামপন্থী দলের যথাযোগ্য স্থান হল বিরোধী দল হিসাবে। সে ক্ষেত্রে তাঁদের সংগতভাবেই এবং কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে না পড়ে সরকারি নীতির সমালোচনা করা সম্ভব। কিন্তু কোনো বামপন্থী দল যদি নির্বাচনীভিত্তিক গণতন্ত্র স্বীকার করে নিয়ে ভোট-যুদ্ধে নামেন, তাহলে সাফল্যের একটা স্তরে পৌঁছলে সরকার গঠন করতে হয় তাঁদেরই, এবং তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ শ্রমিকবিরোধের ক্ষেত্রে। পুরোপুরি মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রে সংঘবদ্ধ শ্রমিক-সংগঠনের কোনো স্থান নেই, কারণ এক্ষেত্রে মূল-নীতি হল যে শ্রমিকেরাই সার্বভৌম এবং প্রশাসকেরা তাঁদেরই প্রতিনিধি। অতএব সরকার ও শ্রমিকদের মধ্যে কোনো বিরোধের প্রশ্নই ওঠার কথা নয়। যদি কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে এরকম কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সরকার তার বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য।

মার্কসবাদী আর্থিক ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগের কোনো স্থান নেই—নেহাত ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্র ছাড়া। সরকারি কর্মচারীদের কাজে শৈথিল্য এ ব্যবস্থায় ক্ষমাহীন। দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলার কোনো সমস্যা সাম্য-বাদী রাষ্ট্রে ওঠা উচিত নয়। অবশ্য প্রথম দিকে কিছু-কিছু অসুবিধা থাকবে, কিন্তু তার গুরুত্ব কমে আসবে, বাড়বে না কখনোই। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসনে এই দিক্-পরিবর্তন এখনো আসে নি। অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান যেটি তার উপরেই সরকার জোর দিয়ে আসছেন—বামপন্থী রাজ্য সরকারকে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করতে হয়। শিল্পনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার সুদূরপ্রসারী—তাই নিজস্ব কোনো শিল্পনীতি নেওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এসব কথা স্বীকার করে নিতে কারো বাধবে না, যদিও সরকারি নীতির সব দিকেই কেন্দ্রীয় বাধা বা অনীহাকে দোষ দেওয়া চলে না। সংবিধানের মধ্যে থেকেও যতটুকু করা যায় বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বেলাতে, তা রাজ্য সরকার করেছেন কিনা, সে প্রশ্ন সহজেই তোলা যায়। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারি ধনপতির সপ্তে যোথভাবে উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবল বাস্তবভিত্তিক যুক্তি দিতে পারেন। গত প্রায় এক দশক কাল ধরে (অর্থাৎ বাম-পন্থী সরকার শাসনভার গ্রহণ করার আগে থেকেই) এই রাজ্যের শিল্পে মন্দগতি প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্য রাজ্যের তুলনায়ও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে। ১৯৭০-এর তুলনায় ১৯৮৩ পর্যন্ত সারা ভারতে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল প্রায় ৮০ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২১ শতাংশ। জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে অবশ্য শিল্পোৎ-পাদনের অর্থমূল্য বেড়েছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ১৯৬০-কে ১০০ ধরে নিলে ১৯৮০-৮১-এ শিল্পোৎপাদনের মোট মূল্য ছিল সারা ভারতে ১৩৯ আর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৮৩২।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে নি। সারা ভারতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেনজে নাম-লেখানো বেকারের সংখ্যা এখন আড়াই কোটি, কিন্তু তার প্রায় এক-পঞ্চমাংশই পশ্চিমবঙ্গে, যদিও এই রাজ্যের মোট জন-সংখ্যা সর্বভারতীয় জনসংখ্যার মাত্র বারো ভাগের এক ভাগ। মাথাপিছু আয় ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত বেড়েছে (মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব বাদ দিয়ে, অর্থাৎ

বাস্তবে হারে) সারা ভারতে ৫১ শতাংশ, আর পশ্চিম-বঙ্গে মাত্র ১৮ শতাংশ। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যা আনুপাতিকভাবে সারা ভারতের চেয়ে পশ্চিম-বঙ্গে অনেক বেশি। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা হচ্ছে খুব কম। অন্যদিকে পুরোনো শিল্পগুলি রুগ্ণ হয়ে পড়ছে। যেসব শিল্পে লাভ হয় তাদের লাভের টাকার পুনর্নিয়োগও হচ্ছে অন্যরাজ্যে—মূলধন এখন পলায়নপর।

কোনো সরকারের পক্ষেই এই অবস্থাতে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। অতএব দ্রুততাতিতে শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াবার ব্যবস্থা জরুরিভাবে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অনুসারে বামপন্থী তত্ত্বের সপ্তে মিল রেখে কাজ করতে হলে সরকারি উদ্যোগ লক্ষণীয়ভাবে বাড়াতে হয়। এ কাজটা করতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে দাবি অনেক, এবং পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পশ্চাৎপদ রাজ্যও আছে। তা ছাড়া, রাজ্য সরকার বলেন যে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিনিয়োগ করতে উৎসাহী নন। সরকারি পরিসংখ্যান দিয়েই এই যুক্তি সমর্থন করা যায়। ভারত সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি যাঁরাই নতুন সরকারি বিনিয়োগ বা অর্থসংস্থান করতে পারেন তাঁরা সবাই পূর্বাঞ্চলের প্রতি অনেকটা বিমুখ। অতএব, যদি সরকারি বিনিয়োগেই কামা হয়, তাহলে রাজ্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের অর্থভাণ্ডার প্রশাসন এবং চালু সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে গিয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়। নতুন সরকারি বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ করতে পারবেন না।

অতএব বেসরকারি শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে উপায় নেই, কারণ, অন্যথায় রাজ্যের আর্থিক অধোগতি রোধ করা যাবে না। আর, যদি বেসরকারি ধনপতিদের আহ্বান করতেই হয়, তাহলে তাঁদের নিরঙ্কুশ অধিকার না দিয়ে, কিছুটা সরকারি অধিকার সংযত্নে করে রাখা যুক্তিযুক্ত ও অনেকটা নিরাপদ। তাই নতুন বড়ো প্রকল্পগুলিতে রাজ্য সরকার ২৬ শতাংশ শেয়ার নিজের হাতে রাখছেন, বেসরকারি মালিক যাতে ৭৫ শতাংশ অধিকার না পায়। ৭৫ শতাংশ অধিকার পেলে বেসরকারি মালিকদের আইনগত সুযোগ-সুবিধা অনেক বেড়ে যায়। এই যৌথ ব্যবস্থায় বিপদ আছে—বেসরকারি শিল্পপতিরা তাঁদের লাভের হিসাব করবেন চুলচেরাভাবে এবং ক্ষতি হলে সেটা রাজ্য সরকারের মাথায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। মূলধন নিয়োগের যে হিসাব এখন করা হচ্ছে সেটা অনেক বেড়ে যেতে পারে—বিশেষত যদি প্রকল্পগুলির কাজ বিলম্বিত হয়। কিন্তু এটাই বড়ো কথা থেকে যায় যে যৌথ উদ্যোগের দিকে যাওয়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাস্তোব গতিরন্যথা।

এটা উলটো দিক দেখলে যুক্তিটা আরো জোরালো হয়। যদি তাত্ত্বিক বামপন্থীদের সমালোচনাকে সম্মান দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পোদ্যোগে এই নতুন পদ-ক্ষেপ না করতেন, তাহলে কী হত? প্রথমত, একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ, বিদেশী বা অনাবাসিক ভারতীয় মূল-ধনের প্রবেশ, বড়ো শিল্পের লাইসেনস দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যসরকারের কোনো সংবিধানগত বা আইনগত অধিকার নেই। অন্যদিক থেকে যতই অবাঞ্ছনীয় হোক, ভারতের বাকি অংশে যদি বিদেশী মূলধন, শিথিল শিল্পনিয়ন্ত্রণ এবং উদার আমদানি নীতির ফলে শিল্পের উন্নতি হয়, আর পশ্চিমবঙ্গ যদি আগের মতোই চলতে থাকে, তাহলে এখন আতঙ্করাজ্য যে বৈষম্য আছে, সেটা আরো বেড়ে যাবে। আমদানি নীতি উদার হলে, পশ্চিম-বঙ্গ বলতে পারে না যে আমরা আমদানি করব না। যদি শিল্পনিয়ন্ত্রণ শিথিল করে শৈথিল্যের ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়, অনেক জিনিসকে লাইসেনসের আওতার বাইরে আনা হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে পারে না। তা ছাড়া, ভারত সরকারের উদারতায় যদি অন্য রাজ্যে বিদেশী মূলধন আসতে থাকে, তাহলে আমাদের দেশীয় মূলধনও সেদিকেই যাবে। আমাদের শিল্পপতিরা বিদেশী সহায়তার ও সহযোগের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সর্বভারতীয় নির্দিষ্ট পথে আসতেই হয়। এই পথে এসে লাভ কতটা, সেটা পরিমাপের আগেই দেখা উচিত যে নিজেদের সর্ব-ভারতীয় নীতি থেকে বিচ্যুত করে আনলে ক্ষতি কতটা। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বিগত বৈঠকে (৯ নভেম্বর ১৯৮৫) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সংগতভাবেই বলে-ছিলেন যে সপ্তম পরিকল্পনার কর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সর্বভারতীয় পরি-

কল্পনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। ঠিক এই কথাই যৌথ উদ্যোগের বেলাতে বলা প্রয়োজন—সারা ভারতে যদি কোনো নীতি চালু করা হয়, তাহলে তার থেকে বেরিয়ে আসা কোনো রাজ্যের পক্ষেই সম্ভব নয়—সে রাজ্যের সরকারের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন।

যদি শুধু এই কথাগুলি বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের যৌথ উদ্যোগের নীতির পথে অগ্রসর হতেন, তাহলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আর কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু, তথাকথিত মার্কসপন্থী তাত্ত্বিকদের সন্তুষ্ট না করতে পারলে বোধহয় তাঁদের অপরাধবোধের ক্ষালন হয় না। এবং এটা করতে গিয়েই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। সহজেই বোঝা উচিত যে, বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কী করণীয় তার নির্দেশ মার্কসের রচনায় পাওয়া যাবে না। শতাধিক বছর আগে মার্কসের পক্ষে সম্ভব ছিল না আজকের পৃথিবীর নিতান্তন জটিলতার রূপ উপলব্ধি করা। একচেটিয়া উৎপাদন এবং ব্যবসায়ের প্রসার, বহুজাতিক সংস্থা, অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ, দ্বিধাবিভক্ত সামরিক শক্তির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে মিশ্র অর্থনীতি, যৌথ উদ্যোগ—এসবই মার্কস-পরবর্তী যুগের বিকাশ। তা ছাড়া, মার্কসবাদ বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা নিয়ে বিতর্কের সীমা নেই। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি নিয়ে যেসব মার্কসীয় আলোচনা হয় তার মধ্যেও মতৈক্য নেই। 'অসমান বিনিময়', 'কেন্দ্র-প্রান্তিক' সম্পর্ক, অনুন্নত দেশকে উন্নত দেশের মুখাপেক্ষী করে রাখা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কিসের উপরে জোর বেশি পড়বে তাই নিয়ে প্রচুর মতভেদ।

হয়তো বলা যায় যে, রাশিয়া আর চীনের পথে যদি পার্থক্য থাকে, 'ইয়োরো-কমিউনিজম'কে যদি অস্বীকার না করা যায়, তাহলে একটা পশ্চিমবঙ্গীয় মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠাই বা কেন করা যাবে না? এই রাজ্যের শাসকদল অবশ্য এতদূর যান নি। তাঁরা মার্কসীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের সরল তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বিরোধ থেকে ধনতন্ত্র জন্ম নেয়। অর্থনৈতিক বিবর্তন ধনতন্ত্রের ইতিহাসনির্দিষ্ট কাজ হল পুরোপুরি বিকাশ লাভ করা, যাতে সামন্ততন্ত্র একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ধনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তার মধ্যেকার অন্তর্বিরোধগুলি জেগে উঠবে। ফলে ধনতন্ত্রেরও অবসান হবে, এবং তার জায়গায় আসবে বিবর্তনের শেষ পর্যায় বা সমাজতন্ত্র। অতএব, পশ্চিমবঙ্গে যখন সামন্ততন্ত্রের অবসান এখনো হয় নি, তখন ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। ধনতান্ত্রিক শিল্পপতিদের প্রধান ঐতিহাসিক কাজ হবে সামন্ততন্ত্রকে সমূলে বিনাশ করা।

এই যুক্তিতে শিল্পপতিরা আকৃষ্ট হবেন কিনা বলা শক্ত। প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই তাঁদের বলা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের ধনতান্ত্রিক সংগঠনকে ব্যাপ্ত করো, সুপ্রতিষ্ঠিত করো, যাতে একদিন তোমাদেরও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। যাঁরা শিল্পপতি নন, তাঁদের মনেও অনেক প্রশ্ন ওঠে। যদি মার্কসকথিত অর্থনৈতিক পর্যায়-পরম্পরা ইতিহাসের অমোঘ বিধান বলে মেনেও নেওয়া যায়, তাহলে প্রশ্ন হবে এক পর্যায় থেকে আর-এক পর্যায়ে যেতে কোন্ দেশে কতটা সময় লাগবে? ধনতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে তার ইতিহাসনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবে, এর জন্য বাঙালি শবরী কতকাল প্রতীক্ষা করে থাকবে?

এর পরের প্রশ্ন : মার্কসকথিত ঐতিহাসিক পর্যায়গুলি ঠিক একের পর এক পার হয়ে যেতে হবে—এটা কি অপরিবর্তনীয়? এক সপ্তে দুটো স্তর পার হয়ে 'ডবল প্রমোশন' পাওয়া কি অসম্ভব? আজকের দিনে যেসব দেশ সাম্যবাদী, তাদের কোনোটিতেই তো ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ কখনোই হয় নি। রাশিয়া এবং চীন, পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলি—সর্বত্রই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি। এসব দেশে ধনতান্ত্রিক যেটুকু সূচনা দেখা গিয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি। অন্যদিকে, যেসব দেশে ধনতন্ত্র উচ্চতম পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সেসব দেশে বিপ্লবের কোনো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মার্কসের পক্ষে বোঝা অসম্ভব ছিল যে ধনতন্ত্র এমন একটা রূপ নিতে পারে যাতে কর্মহীনতা আর অভিশাপ বলে গণ্য হবে না, যাতে অনেকের পক্ষে নানা রকমের সরকারি সাহায্যের ফলে কাজ করার চেয়ে বসে-বসে সাহায্য নেওয়াই অধিকতর লাভজনক হতে পারে। বিপ্লবের জন্ম হয় অসন্তোষ থেকে, এবং সেই অসন্তোষ

যদি না জন্মায়, তাহলে ইতিহাস কোন্ পথে যাবে? মারগারেট থ্যাচার শিল্প-শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রচুর ভোট পান কেন?

এখানে একথা বলা হচ্ছে না যে, পশ্চিমবঙ্গেও ধনতন্ত্রের এমন একটা রূপ আসবে যাতে বিপ্লবের সম্ভাবনা বহুদূরে চলে যাবে। শুমপিটার বলেছিলেন যে, ধনতন্ত্র একদিন ধ্বংস হবে তার নিজের সাফল্যেরই ফলে। এই তত্ত্ব-ও প্রমাণিত হয় নি। এখানে শুধু একটু বলা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের শিল্পনীতির পক্ষে যে বাস্তবভিত্তিক যুক্তি নিয়েছিলেন—যে এই নীতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—সেটাই যথেষ্ট হত। এর জন্য কোনো তাত্ত্বিক যুক্তিজালের সহায়তার প্রয়োজন ছিল না। এই যুক্তিজাল এখন আর ইতিহাসসম্মত বলে মনে হয় না, আর তা ছাড়া এই তত্ত্বকে সত্য বলে মেনে নিলে ফল হবে বিপরীত—কারণ পরিণামে বিনষ্ট হবার পথে ক্রীড়নক হবার জন্য শিল্পপতিরা আগ্রহান্বিত হবেন না।

এর সপ্তে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের শাসকগোষ্ঠী যে তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়েছেন, সেটা এই রাজ্যে প্রযোজ্য হলে, সারা ভারতেও সমানভাবেই প্রযোজ্য হবার কথা। এই তত্ত্ব মেনে নিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত হবে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি শিল্পপ্রসারের পথ পরিষ্কার করতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন সেগুলিকে জোর দিয়ে সমর্থন করা। যদি পশ্চিমবঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সমূল উৎপাটনের জন্য ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ আগে দরকার হয়, তাহলে সারা দেশের পক্ষেও একথাই খাটে। কেন্দ্রের যে আচরণের আমরা নিন্দা করব, সেটাই আমাদের রাজ্যে গ্রহণীয় আচরণ হবে—এই অন্তর্বিরোধ থেকে রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা উচিত ছিল। জোর গলায় বলা উচিত ছিল যে, সর্বভারতীয় নীতির বিপক্ষে আমাদের যাই বলবার থাকুক না কেন, ওই নীতির কাঠামোর মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হবে, এবং এই নীতি থেকে আমরা যেটুকু সুবিধা পেতে পারি সেটা নিতে হবে। এতে হয়তো তাত্ত্বিক আদর্শ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু মার্কস যদি আবার আজ পশ্চিমবঙ্গে বেঁচে উঠতেন, তাহলে তিনি কী বলতেন তা কে জানে!

বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হবে সিদ্ধান্ত নেবার পরে তার রূপায়নে বিলম্ব। দেরি অনেক কারণে হতে পারে। বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেনস দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার—কী কী জিনিস তৈরি হবে, তার তালিকাও কেন্দ্রের অনুমোদনসাপেক্ষ। আবার বেসরকারি মূলধন পাওয়া যাচ্ছে বলেই যৌথ উদ্যোগে নামতে হবে, এটাও ঠিক নয়। যে শিল্প স্থাপিত হবে তাতে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বা যন্ত্রপাতি, বা রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপন্ন হবে কিনা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে শ্রমনিয়োগ কতটা হবে—এসবই বিবেচনা করতে হবে। বেসরকারি সহযোগীর সপ্তে যে চুক্তি হবে, সেটা প্রণয়নে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর, যত দেরি হবে প্রাথমিক মূলধনী ব্যয় ততই বাড়বে। আজ যে প্রকল্পের জন্য ৭০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে হিসাব করে রাজ্য সরকার তার ২৬ শতাংশ বা ১৮২ কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন, তিন বছর দেরিতে যদি মূলধনী ব্যয় ১০০০ কোটি টাকাতে ওঠে, তাহলে রাজ্য সরকারকে দিতে হবে ২৬০ কোটি টাকা। এ ধরনের চুক্তিতে সাধারণত একটা 'এসকেলেশন ক্লজ' বা মূল্যবৃদ্ধিজনিত ব্যয়-বৃদ্ধি সম্পর্কিত একটা শর্ত থাকে। এই শর্ত যাতে সবটাই সরকারের বিপক্ষে না যায়, সে বিষয়ে সাবধান থাকা প্রয়োজন।

অনেক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে সময়টা এখন শিল্পোদ্যমনের নতুন প্রচেষ্টার জন্য অনুকূল। বিদ্যুতের ঘাটতি অনেক কমেছে এবং আশা করা যায় যে, ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে সরবরাহের আরো উন্নতি হবে। যৌথ উদ্যোগে যেসব বড়ো কারখানা স্থাপিত হবে সেগুলিতে অবশ্যই নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু তার জন্য কয়লা সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। শিল্পবিরোধী পশ্চিমবঙ্গের অন্য রাজ্যের চেয়ে বেশি নয়, এটা শিল্পপতিরা বুঝে গিয়েছেন। কলকাতা বন্দরের উন্নতি হচ্ছে। উচ্চস্তরের শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদের অভাব এই রাজ্যে নেই। শিল্পপরিচালনার উচ্চস্তম ক্ষেত্রে অনেক বাঙালি অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁরা বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী নন, কিন্তু সুদক্ষ প্রশাসক তথা পরিচালক। এত সব সুবিধা থাকতেও এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আশাপ্রদ পরিবর্তন সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে মন্দগতি যদি রোধ করা না যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দক্ষতার অভাবই প্রমাণ হবে।

এই দক্ষতার অভাব এতদিন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান অবস্থায় বাধ্য হয়েই সরকারকে বড়ো শিল্পপতিদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নামতে হচ্ছে। এই অবস্থাটা আসত না যদি গত আট বছর এই রাজ্যে মাঝারি আর ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে সরকার যথেষ্ট মনোযোগী হতেন। কাগজেকলমে ছোটো শিল্পের সংখ্যা বেড়েছে বলে দেখানো হয়, কিন্তু উৎপাদনের পরিসংখ্যানে তার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না। রাজ্য সরকার হলদিয়া প্রকল্পে যে ২৫০ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সে টাকাটা দিয়ে অন্তত ২৫,০০০ ক্ষুদ্র শিল্পকে বা ৫০০ মাঝারি শিল্পকে সাহায্য করা যেত। তাতে কর্মসংস্থান হত অনেক বেশি, সময় লাগত অনেক কম, সরকারের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি কার্যকর হত, এবং দিল্লীর অনুগ্রহপুষ্ট বড়ো শিল্পপতিদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরকারকে জড়িত হতে হত না। এখন সরকার যে পথে যাচ্ছেন, আশা করা সংগত যে সেটাই একমাত্র পথ হবে না। ক্ষুদ্র আর মাঝারি শিল্পের প্রসার ছাড়া আমাদের সমস্যার কোনো পূর্ণ সমাধান নেই। যা এতদিন করা উচিত ছিল, অথচ করা হয় নি সেটা নিয়ে বিলাপ করে লাভ নেই, কিন্তু এখন নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে রাজ্য সরকার একটা সুসম্পূর্ণ শিল্পনীতি গ্রহণ করবেন।

নীল সাবানের প্রেম

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

নীল সাবানে মেয়েটি ধোয় আগুনরঙা শাড়ি
তার বুকের মধ্যে শিশিরজমা দুঃখের ফেনা
চোখের মধ্যে জীবনযাপন
কষ্ট দেনা
একটি মানুষ সেই যে গেলো, আর এলো না বাড়ি।

নীল সাবানে মেয়েটি ধোয় লাল কাপড়ের দুখ,
উত্তরে কি যুদ্ধ হচ্ছে, কোথায় যেন
মানুষগুলো বুকের রক্তে ভিজায় মাটি
কেবল কেন
রাতদুপুরে পাথপাখালি আগুন জ্বালায়—
চোখের জলে হয় না ধোয়া ব্যথার মলিন মুখ।

নীল সাবানে মেয়েটি ধোয় নীরব চোখের জল।
তার চুলের মধ্যে অস্ফুটতার কান্না গাঁথা
লাল টাসেলে
নদীর জলের ঢেউ এসে দেয় একলা চুমু
হাঁটুর মূলে,
গোপন শিরায় জলবিহারী মাছের কোলাহল।

ধুচ্ছে আশা, ধুচ্ছে মানুষ, ধুচ্ছে বুকের খুন
নীল সাবানে নির্জনে ধোয়
রক্তপাত সুখসমুদয় নির্জনতা
কান্নাহাসির ভেতর থেকে নরম দুটো হৃদয়-নিলয়
ধুচ্ছে ঘাটের পৈঠাতে সে বিষণ্ণ তুরপুনে।

নীল সাবানের ফুরিয়ে যাবে গভীরপ্রেমিক মন
নদীর জলে ভাসবে মেয়ের শাড়ি ও যৌবন।

কম্পোজিটর সাজিয়ে রাখে শব্দ

ইকবাল আজিজ

কম্পোজিটর বাড়িয়ে হাত অক্ষর সাজায়—
দূর বহুদূর হাত চলে যায় সুদূর দিনের কাছে।
প্রাচীন শৈশব—কিছু-কিছু ভুল আর
পাখির বাসার রাত—এইসব ছুঁয়ে দুলে ওঠে
গ্রাম, নদীতীর—মধুমতী বা আড়িয়ল খাঁ
জলছলছল, হাত ভিজে যায়
মোহিনী কম্পোজিটর সুদূরে তাকায়

পূর্বপুরুষ দাঁড় বেয়ে যেত দিনরাত।
আজ সে অন্যরকম দাঁড় বায়, হাতের আঙুল
যেন নৌকোর মেঘলা সারি—ভেসে যায়
খোয়াবের ফ্যাকাশে পানিতে।
মুগদাপাড়ায় খুদেঘরে তার সংসার—
নিজেই নিজেকে করে প্রতিদিন সংহার

আবার সে বেঁচে উঠে অক্ষর সাজায়।
রাত্রিবেলায় বিভিন্ন শব্দ সে সাজিয়ে রাখে
নিকস পাঁজরে—জীবিকার মোহনায়।

কাঁটাঝোপে লেগে হাত ছড়ে যায়
কম্পোজিটর বাড়িয়ে হাত অক্ষর সাজায়।
দূর বহুদূর হাত চলে যায় সুদূর দিনের কাছে
ওই পাড়াতে নদী বয়ে যায়, হারানো কিশোর বাঁচে!

ভোরের বাতাসে

শিহাব সরকার

আসছে সোঁদা হাওয়া
জানি না ভোরের কি রাত্রির স্বেচ্ছাচারের
ভেবে সুখ পাই
আসছে ভোরের হাওয়া

আমাদের শহরের কূল ঘেঁষে
শান্ত মেজাজের নদী আছে
এ ধরনের নদী
দূরে কোনো পর্বতচূড়ায়
ভোরের ঔরস থেকে এঁকেবেঁকে
নেমে এসেছে সমতলে
নদীর বাতাসে ভোরের মদিরা
শহরের ভেজা ছাদ থেকে
ভোরের গান করি, রোদের গান করি
আজ যদি রোদ ওঠে!

কবে জানি ভরে গিয়েছিল শিউলিতলা
ফুল-বালিকাদের সুরভিতে
বেড়াতে গিয়েছিল খোলা মাঠে
একা কিংবা দলে-দলে
আমাদের প্রবীণ পিতাপূর্বুষেরা

যদি ভোর থেকে
শুরু হয় অস্তসূর্যের লোকাচার
যদি ভোরের বাতাসে
উড়ে আসে মরা নদীর উত্তপ্ত বালুকণা
কেন এই গান কেন এই গান

কবিতার নায়ক

খালেদা এদিব চৌধুরী

এই নির্ঘুম চোখে অবিরাম জ্যোৎস্নার বারিপাত
প্রতি প্রহরের শ্রমে ঘন্টা বাজে, বনভূমি কাঁপে
নিদ্রাকে শোক দেয়—জাগরণে বিষণ্ন স্মৃতি
যেন পাখির মরাল গ্রীবায় আদিম মন্দ্রার ঢঙ
খুব নিমেষেই একবার দেখা দেবে সুনীল অন্ধকার।
সমুখেই মহাবিপ্লবী নায়ক—কবিতার প্রধান চরিত্র আমার
হাজার বছর পরেও বেঁচে থাকবে জেনো
স্মৃতি ঘুরে বেড়াবে ইথারে—
অথচ ঘুনে-ধরা দরোজা ধ্বংস হবে মেহগনি কাঠের...
তুমি থাকবে কবিতায়
কেউ-কেউ স্মৃতি বলে যাবে
অলীক চুম্বনরেখা ছায়া ফেলবে কোনো মহালয়ে
দিবস ফুরিয়ে যাবে.....
নিদ্রায় জড়িয়ে তন্দ্রা কাঠঠোকরা পাখির ঠোঁটে
উষ্ণতার স্পর্শে আমাদের পরমায়ু
ছড়িয়ে দেবে স্মৃতির গোলাপি রঙ।
হে আমার প্রিয় কবিতা, তুমি সুন্দরবনের বাঘের মতো
রাজকীয় ভঙ্গিতে অভিষিক্ত হও—
আমার নির্ঘুম চোখে ভালোবাসার পরমায়ু
অবিরাম জ্যোৎস্নার বারিপাত।

গাহে অচিন পাখি

ইমদাদুল হক মিলন

হাওয়ায় কী একটা ভাজা-পোড়ার গন্ধ ওঠে। ভারি মনোহর। সেই গন্ধে মাছচালার ধুলোবালি থেকে মুখ তোলে বাজারের নেড়িকুত্তাটা। তারপর প্রথমেই তার প্রভু পবন ঠাকুরকে খোঁজে। নেই। গন্ধে আর প্রভুর টানে কুত্তাটা তারপর উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে পুরোনো কালের রোঁয়াওঠা, মন্দা শরীরখানা টানা দেয়। তখন দেখে, দূরে খাদ্য খাওয়ার দোকানটার সামনে প্রভু বসে আছে। গন্ধটাও সেদিক থেকেই আসছে।

কুত্তাটা তারপর কিছু না ভেবে গন্ধের দিকে, প্রভুর দিকে ছুটে যায়।

আমার বাপে আছিলো ডাকাইত। বিক্রমপুরের বুড়া মাইনষের মুকে হোনবেন কেষ্ট ঠাকুরের নামডাক। মাইনষে কইতো কেষ্টা ডাকাইত। যাগ বয়েস পাঁচ কুড়ি ছয় কুড়ি। আমার বাপের নামে হেই আমলে গেরস্তরা রাইত্রে গুমাইতো না। রাইত্রে বিচনায় হুইয়া পোলাপান কানলে বউ-ঝিরা কইতো, কেষ্টা আইলো। কেষ্টার নামে পোলাপানও ডরাইতো। কান্দন থামাইতো, গুমাইয়া পড়তো। গেরামে গেরামে মাইনষে চকি দিত। দল বাইন্দা। কেষ্টারে ঠেকাও। অইলে অইবো কী, কাম অইতো না। বাপে আমার ঠিকঐ মাইনষের মাথায় বাড়ি মারতো। সর্বশান্ত করতো। দিবেননি কত্তা একখান আমিত্তি?

লতিফ ময়রা খুব মনোযোগ দিয়ে রসে-ডোবা আমৃত্তি তুলে মাটির ঝাঁজরে রাখছিল। ঝাঁজরের নীচে বসানো একখান বালতি। আমৃত্তির রস চুইয়ে-চুইয়ে পড়ছে তাতে।

লতিফ বসে আছে মাটি থেকে হাতখানেক উঁচু একটা চৌকির ওপর। তার ডানদিকে, দোকানের ভেতর মিষ্টির আলমারি। ওপরের দুটো র‍্যাকে সাজানো চমচম বালুশাই কালোজাম সন্দেশ আমৃত্তি আর গজা। আর নীচের র‍্যাকে পেতলের বিশাল গামলায় রসে-ডোবা রসগোল্লা, লালমোহন আর ছানার আমৃত্তি। সারাদিনে সতেরো বার আলমারির কাঁচ মোছে লতিফ। পদ্মার জলের মতো ঘোলা কাঁচ। একটার এককোনা ভাঙা। আর দুটোতে হিজিবিজি ফাটল। হলে হবে কী, কাঁচ পালটায় না লতিফ। অযথা পেচ্ছাপ-পায়খানার মতো কিছু পয়সা

বেরিয়ে যাবে। দরকার কী। ভাঙা আলমারিই কি কম দেয়!

লতিফের বাঁ দিকে, দোকানের বাইরে পরপর সাজানো আঁটাল মাটির তিনখান আলগা চুলা। একখান দুমুখী আর দুখান একমুখী। দুমুখীটায় বিয়ানরাতে এসে তুলে দেয় পুরোনো কালের বিশাল একটা কেটলি। হ্যানডেলে ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় জড়ানো। তাপে-তাপে পোড়ামাটির রঙ ধরেছে।

কেটলির মুখে পাতলা কাপড় দোপাল্লা করে বাঁধা। ছাঁকনি। রাত একপ্রহর অব্দি চায়ের জল ফোটে কেটলিতে। বিয়ানরাতে একবারমাত্র পদ্মার জল আর চা-পাতা ছেড়ে চুলায় ওঠায়। তাতেই রাত একপ্রহর অব্দি চলে। গাঁও-গেরামের লোকে কত আর চা খায়! তবুও পুরো এক কেটলি চা শেষ হয় লতিফ ময়রার। আর তিন-চার সের দুধ।

দুধের কড়াইটা থাকে কেটলির পাশেই। দুমুখী চুলার অন্যটায়। চায়ের গেলাস, চিনির টোফা থাকে লতিফের পায়ের কাছে। চুলার সঙ্গে। গাহাকরা চাওয়া মাত্রই কেটলিটা গেলাসের ওপর একটুখানি কাত করে লতিফ। তারপর গোল চামচে এক চামচ দুধ, ছোট্ট চামচে দেড় চামচ চিনি। হাতের মাপ বটে লতিফের। একফোঁটা দুধ এদিক ওদিক হয় না, একরোঁয়া চিনি। এ সবই অভ্যেস। বহুকালের।

লতিফের দোকানটা ছোটো। দোকানের ভেতর মিষ্টির আলমারিটা, কিছু হাঁড়ি-পাতিল, বস্তা আর চৌকিটা ছাড়া অন্য কিছু থোয়ার জায়গা নেই। গাহাকরা লতিফের বসে সব বাইরে। বাইরে, লতিফের দোকানের সামনেটা খোলামেলা। একদিকে লতিফের চুলাচাক্কি আর অন্যদিকে লম্বা একখানা টেবিল। পায়া নড়বড় করে তার। টেবিলের দুপাশে লম্বা দুখানা বেনচি। বেনচির গা ঘেঁষে লতিফের দোকানের দু নমবর ঝাঁপ ঠিকনা দেয়ার বাঁশটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যটা চুলার কাছে।

সবই অনেক কালের পুরোনো জিনিসপত্র। কিছুই বদলানো হয় নি লতিফের। পাই-পাই হিসেব করে এই অব্দি এসেছে। সংসারটা ভারি লতিফের। সাতখান পোলাপান। আর-একখান আছে বউর পেটে। মাস দুয়েক বাদে নাজেল হবে। বুড়ি মা আছে। আর একটা ঢ্যাঙা বোন। কুড়ির ওপর বয়েস। বিয়ে দেওয়া হয় নি। টাকা-পয়সার অভাব।

ভোর থেকে রাত দশটা অব্দি দোকান চালায় লতিফ। তারপর ক্যাশবাকস খালি করে টাকাকড়ি বাঁধে তফিলে। দোকানে ভারি চারখানা তালা লাগায়। তারপর দেড় মাইল বিল পাড়ি দিয়ে বাড়ি যায়।

জশিলদিয়া থেকে মেদিনীমণ্ডল যেতে মাঝে এক-বিল। পাক্কা দেড় মাইল। চাঁদনি রাতে সেই বিল পাড়ি দিতে-দিতে লতিফ কেবল একটা কথাই ভাবে—এইদিন থাকব না। দোকানের আয় উন্নতি বাড়ব। টেকাপয়সার অভাব মাইনষের চিরদিন থাকে না।

এই কথাটা লতিফ ভেবে আসছে, আজ সতেরো-আঠারো বছর। কিন্তু দিন বদলায় নি। আয়-উন্নতি বাড়ে নি লতিফের। যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেছে সব। দোকানটা আর লতিফ নিজে। আসলে লতিফ তার জীবনের ঘোরপ্যাঁচটা বোঝে না। আয়-উন্নতি বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খরচাটাও যে বেড়েছে লতিফ তা বোঝে না।

এই দোকান দেওয়ার পরই বিয়ে করেছে লতিফ। মা-বোন ছাড়া আর-একটা নতুন মানুষ। তার খাইখরচা। সাধ আহলাদ। তারপর বছর-বছর আর-একজন করে। সাকুল্যে মানুষ এখন এগারোজন। আর-একজন নাজেল হওয়ার ফিকির করছে।

টাকাপয়সার মারটা যে এইখানে, লতিফ তা বোঝে না। এখনো আশায় আছে—এইদিন থাকব না। আয়-উন্নতি বাড়ব। জীবন অন্যরকম অইয়া যাইব।

দু-একখানা বড়ো গাহাক পেলে ধারণাটা জোর পায় লতিফের। এই যেমন আজ। সকালবেলা কান্দিপাড়ার মাজেদ খাঁ আধমন আমৃত্তির অর্ডার দিয়ে গেছে। কাল সকালে নেবে। বাপের চল্লিশার মেজবানি। গোরু মারবে একখান। আর আগল-আগল ভাত। পয়সা দিয়েছে আল্লায়। আত্মাটাও বড়ো মাজেদ খাঁর। মাংস-ভাতের পর খাওয়াবে আমৃত্তি। আর অন্যদিকে সত্তর-আশি টাকার কাজ হয়ে যাবে লতিফের। সেই সুখে সারাদিন বিভোর হয়ে ছিল লতিফ। সকালবেলা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছে মাজেদ খাঁ আগাম। টাকাটা হাতে পেয়েই জিনিসপত্র জোগাড় করেছে লতিফ। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, রাতে ফিরবে না। একলা মানুষ। পুষ্যি অনেক। সেই ভয়ে দোকানে কর্মচারী রাখে না লতিফ। একলাই আধমন আমৃত্তি বানাতে হবে। আধমন আমৃত্তি কি যা তা কথা! রাত কাবার হয়ে যাবে।

জিনিসপত্র জোগাড় করতেই দুপুর পার হয়ে গেছে লতিফের। তারপর একমুখী চুলো দুটো সাজিয়ে, একটায় চিনির সিরা তুলেছে। অন্যটায় তেলের কড়াই। পায়ের কাছে, ক্যশবাকসের সঙ্গে বড়ো একটা অ্যালু-মিনিয়ামের ব্যাঁকাত্যাড়া গামলায় ময়দা, পানি আর কলাই মিশিয়ে, হাতে যখন নারকেলের তলা-ফুটো আইচা নিয়ে বসেছে, তখন দুপুর পার। বাজার ভেঙে গেছে। বাজারটা চালু থাকে দুপুর অব্দি। মানুষের হল্লা-চিল্লা, দোকানিদের হাঁকডাক, আনাজপাতি-পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে থাকে। আর পচা মাছের বোঁটকা একটা গন্ধ আসে মাছচালার দিক থেকে। এসবের ওপরে আছে বাজারের সম্পূর্ণ আলাদা চিরকালীন গন্ধটা।

সকালের দিকে আজার পায় না লতিফ। বাজার করতে এসে গেরামের গণ্যমান্য লোকেরা লতিফের দোকানে আসে চা খেতে। বরাত ভালো থাকলে মিষ্টিও খায়। এক-আধ সের কিনেও নেয় কেউ-কেউ। সেই আয়ে জীবন চলে যাচ্ছে লতিফের। আজ সতেরো আঠারো বছর।

তারপর দুপুরবেলাটা সব ফাঁকা, নিটাল। জনা সাতেক স্থায়ী দোকানদার ছাড়া বাজারের নেড়ি কুত্তাটা আর পবনা পাগলা, সারা জশিলদিয়া বাজারের কেবল এ ক-জনই। জেলেরা যে যার ঝাঁকা মাথায় ফিরে যায়। চারপাশের গেরাম থেকে যেসব গেরস্তরা খেতের আনাজ-পাতি নিয়ে আসে, গোয়ালারা আসে দুধ নিয়ে—বিক্রি হলে ভালো, না হলে যে যার বস্তু নিয়ে দুপুরের মুখে-মুখে ফিরে যায়। বাজারের খোলা চত্বরে তখন পবনা পাগলা, নেড়ি কুত্তাটা আর দোকানের ভেতর আজার দোকানিরা।

বাজারখোলার পাশেই বড়ো গাঙ, পদ্মা। দুপুরের পর পদ্মার হু-হু হাওয়া এসে বাজারের ধুলোবালির গন্ধটা একটুখানি উশকে দেয়। তখন বাড়ি থেকে আনা ভাত-পানি খায় লতিফ। তারপর খালি গায়ে, বাবুরহাটের লুঙিপরা, মাজায় বাঁধা একটা লাল গামছা—ক্যাশবাকসের পাশে আয়েশ করে বসে বিড়ি টানে। আজ সেই আজারটা পায় নি লতিফ। ভাতটা একফাঁকে খেয়ে নিয়েছে। তার-পর বিড়ি টানতে-টানতে, আধমন আমৃত্তির মাল-সামান ঠিকঠাক করে যখন বসেছে, তখন বিকেল হয়-হয়। চার-পাঁচ খোলা আমৃত্তি তুলে ঝাঁজরের ওপর রেখেছে লতিফ, তখন দু-তিন জন গাহাক এল। গেরামের যুবক পোলাপান। তাই দেখে এক হাতে আমৃত্তি আর অন্য হাতে চা বানিয়ে ফেলে লতিফ। তারপর গাহাকদের টেবিলে দিয়ে যখন আবার এসে চুলার পাড়ে বসে, তখন টের পায় আমৃত্তি ভাজার গন্ধে বাজারের হাজার বছরের পুরনো গন্ধটা বেপাত্তা। হু-হু হাওয়া বাজারময় বয়ে বেড়াচ্ছে আমৃত্তি ভাজার মনোহর গন্ধ। সেই গন্ধে, সতেরো-আঠারো বছরে যা হয় নি লতিফের আজ তাই হয়। পেটের ভেতরটা চনমন করে ওঠে। একখানা আমৃত্তি খাওয়ার সাধ জাগে।

কিন্তু কাজটা করে না লতিফ। একখানা আমৃত্তির দাম পড়ে এক সিকি। একদিন খেলে যদি লোভটা বেড়ে যায়! লোকসান। লোকসান হলে পুষ্যিরা খাবে কী!

এসব ভাবতে-ভাবতে আরেক খোলা আমৃত্তি তোলে লতিফ। তখন দেখে চুলার ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে পবন ঠাকুর। লোকে বলে পবনা পাগলা। চেহারা সুরত কী শালার! ধড়খান মরা গয়া গাছের মতো। মাথাভরতি বাবরি চুল। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। চোখ দুটো গর্তে। তবুও ভাটার মতো দেখতে। হাত-পা মরা ডাল-পালার মতো পবনার। বুকের পাসলী গোনা যায়। পেটখান দেখলে মনে হয়, ফেনগালার মাইট্টা খাদা উলটো করে বসানো। তার তলায় টুটাফাটা একখানা ধুতি। জন্মের পর থেকেই পরে আছে।

মাছচালার মাটিতে শোয় পবনা, মাটিতে বসে। ফলে ধুতিটার রঙ হয়েছে বাজারের বাইলা মাটির মতো। আর পবনার গায়ের গন্ধটা বটে, বাজারের হাজার বছরের পুরোনো গন্ধটাও বাইসানরে বলে পালায়। পবনা হেঁটে গেলে মনে হয়, গেরস্তর আনাজপাতির খেত থেকে খড় আর বাঁশের মাথায় পোড়া মাটির মালসা বসানো কাক-তাড়ুয়া হেঁটে যাচ্ছে। গেরস্তর খেতখোলা পাহারা দেয়, ইঁদুর বাদুড় তাড়ায়।

পবনাকে দেখলে বাজারের লোকজন যায় খেপে। কুত্তা-বেড়াল খেদানোর মতো দুর-দুর করে। কিন্তু পবনাও, চিজ একখানা—কারো দোকানের সামনে গেলে কিছু না কিছু আদায় করবেই। ঘেঙটি পাড়ার ওস্তাদ।

দিনরাত ভরপেট খিদে নিয়ে ঘোরে। দোকানিদের কাছে যায়। এটা নেয়, ওটা নেয়। তারপর মাছচালার ওদিকে, নিরালায় বসে আয়েশ করে খায়। সঙ্গে থাকে বাজারের নেড়ি কুত্তাটা। জগৎসংসারে এই একটাই জীব, পবনার বড়ো বাধ্যক। পবনা নিজে খাবে যা তার একটু-আধটু কুত্তাটাকে দেয়। রাতের বেলা, পবনা যখন ধুলোবালি গায়ে দিয়ে মাছচালায় শোয় কুত্তাটা থাকে পাশে। পাশাপাশি দুটো জীবকে একরকমই দেখায়। খোলা-বাজারে যেসব গেরস্তরা আনাজপাতি নিয়ে বসে, ভালো বেচাবিক্রি হলে খুশিমনে এক-আধ পয়সা দেয় পবনকে। পবনা তখন অন্য দোকানিদের কাছ থেকে দু-পয়সায় দু-আনার জিনিস আদায় করে। কত কাল ধরে যে এটা চলে আসছে কেউ জানে না। লতিফও না। লতিফ এই বাজারে আছে সতেরো-আঠারো বছর। তখন থেকে পবনাকে দেখে। একইরকম। ওই একখান ধুতিপরা, একরকমই চেহারা সুরত। দিন এল গেল, লোক বদলাল। পবন ঠাকুর বদলায় নি। আরো কতকাল যে এই সুরত আর ধুতিখান নিয়ে টিকে থাকবে, কে জানে।

পবনাকে দেখে এখন এই কথাটা মনে হয় লতিফের। তারপর একটু মায়া হয়। দূর-দূর করে না তাড়িয়ে লতিফ বলল, কী রে পবনা, কই আছিলি হারাদিন? আইজ দিহি তরে দেকলাম না?

এই কথায় পবনা খুব খুশি। কেউ নরম গলায় কথা বললে সেখানে সে লেগে যায়। এখনো তাই করে। লতিফের চুলার ওপারে, ঝাঁপ ঠিকনা দেওয়ার ত্যারা-হয়ে-দাঁড়ানো বাঁশটার সঙ্গে মাটিতে আসনপিঁড়ি করে বসে। তারপর দাঁত কেলিয়ে হাসে। আপনেরে তো হারাদিনঐ দেকলাম কত্তা। বহুত কাম করতাছেন।

হ। ম্যালা কাম পইরা গেছে আইজ। হারা রাইতই দোকানে থাকতে অইবো।

ক্যা?

মাজেদ খাঁর বাপের চল্লিশা কাইল। আদমোন আমিত্তি বানাইয়া দিতে অইবো।

লোকের ভালো খবর শুনলে পবনা খুব খুশি হয়। যেন নিজেরই বিরাট একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে—এমন গলায় বলল, আ-হা-হা-হা-হা। ভালাকতা, বহুত ভালাকতা। ভগমান দেউক, আরো দেউক আপনেরে।

ঠিক তখুনি মাছচালার দিক থেকে ছুটে আসে নেড়ি কুত্তাটা। পবনার দোসর।

লতিফের গাহাকরা ওঠে এসবের একটু পরে। পয়সা দিয়ে চলে যাওয়ার পর লতিফ দেখে গেলাসগুলো টেবিলের ওপর পড়ে আছে। তার হাত আজার না। একহাতে আমৃত্তি পেঁচিয়ে ছাড়ছে তেলের কড়ায়ে আর অন্যহাতে রসের সিরা থেকে তুলে ঝাঁজরে রাখছে। টেবিল থেকে চায়ের গেলাস আনে কে?

লতিফ বলল, এই পবনা, গেলাসটি আন।

কেউ কোনো কাজের কথা বললে পবনা খুব খুশি হয়। ছুটে গিয়ে গেলাস এনে দেয়। দুইয়া দিমু?

লতিফ ভাবে, পবনার আতে চার গেলাস দোয়াইতে দেকলে বদনাম অইয়া যাইবো। গেরামের গইন্য-মাইন্য মাইনষে তাইলে আর আমার দোকানে চা খাইতে আইবো না। এগারোজন পুষ্যি লইয়া আমি কি তাইলে না খাইয়া মরুম! ইট্টুহানি আয়াশের লাইগা দোকানের বদলাম করুম!

লতিফ ব্যবসায়ী মানুষ। মুখে এসব কথা বলে না। পবনা পাগল-ছাগল মানুষ। বাজারের নেড়ি কুত্তা। তবুও। কায়দা করে বলল, না, থাউক। থুইয়া দে। আইজ আর গাহাক আইবো না। আজাইর পাইলে আমি ধুমু নে।

গেলাস কটা লতিফের পায়ের কাছে রেখে দেয় পবনা। তারপর আবার মাটিতে আসনপিঁড়ি করে বসে। একখান আমিত্তি দিবেন নি কত্তা?

শুনে লতিফ একটু বিরক্ত হয়। নারকেলের আইচায় তেলের কড়াইয়ের ওপর প্যাঁচিয়ে-প্যাঁচিয়ে আমৃত্তি ছাড়ে।

তুই হারাদিন খালি খাওনের প্যাচাইল পারচ ক্যা?

এ কথায় পবনা খিকখিক করে একটু হাসে। কী করুম কত্তা, পোড়াপেটখান খালি খাই-খাই করে। আর আইজ আপনে যেই আমিত্তি ভাজতাছেন, ঘেরানে গাঙের মাছও উপরে উইট্টা যাইবো। আমি তো মানুষঐ। গাঙ-পার বইয়া আছিলাম। তহন বাজার থনে একখান বাতাস গেলো। হায়-হায়, বাতাসে খালি আমিত্তির ঘেরান। আমি পাগলের লাহান দৌড়াইয়া আইলাম।

লতিফ কোনো কথা বলে না। হাসে। আর মনোযোগ দিয়ে তেলের কড়াইয়ে আমৃত্তি ছাড়ে, আমৃত্তি তোলে।

পবনা বলল, দেন একখান আমিত্তি। ভগমান আপনের কিরপা করবো। শুনে লতিফ কেন যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর উদাস গলায় বলে, পবনা রে, আইজ হারা রাইত আমার আমিত্তি ভাজন লাগবো। তুই এই চুলার পারেই বইয়া থাকিচ। হারা রাইত। বোজচ না, একলা মানুষ হারা রাইত বইয়া আমিত্তি ভাজুম। আমার ডর করে। বাজানে কইতো আমিত্তি ভাজনের ঘেরানে বলে পরিস্তান থনে জ্বীনপরীও আইয়া পড়ে।

পবনা বলল, এই যে আপনের এহেনে বইলাম কত্তা, আর উডুম না। তয় একখান কতা কই আপনেরে, আইজ এই বাজারে জ্বীনপরী আইবোই। যেই ঘেরান বাইরাইছে। তামাম দুনিয়া ঘেরান পাইবো।

লতিফ কোনো কথা বলে না। এককড়াই আমৃত্তি ছেড়ে ওঠে। তারপর দোকানের ভেতর থেকে দুটো-দুটো করে আটখান মাটির পাতিল এনে চৌকির কাছে, মাটিতে সার ধরে রাখে। আড়াই-সেরি পাতিল একেকখান। নব কুমোরের দোকান থেকে দুপুরবেলাই এনে রেখেছে।

দেখে পবন বলল, কয় সেইরা পাইল্লা?

আড়াই সেইরা।

কয়খান?

আষ্টখান। তুই কি নিকাশ বুজচ না? আড়াই-সেইরা আষ্টখান পাইল্লা না অইলে আদমোন আমিত্তি আডে নি?

পবনা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসে। হ। তয় একখান কতা কই আপনেরে কত্তা, আমি কইলাম পুরা আড়াই সের আমিত্তি এক বহায় খাইতে পারুম। এক ঢোকও পানি খামু না। এট্টুও উডুম না।

শুনে ধমকে ওঠে লতিফ, বড়ো প্যাচাইল পারচ তুই। তর বাপে নি খাইছে কুনোদিন এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি?

মাছচালার দিক থেকে হেঁটে আসছিল আউয়াল। মুদি-মনোহারির দোকান চালায়। সারাদিন দোকান করে, সন্ধেবেলা দোকানে তালা মেরে বাড়ি যায়। রাত-বিরাত দোকানে থাকে না আউয়াল। আগে থাকত। নতুন বিয়ে করেছে, রাতের বেলা বউর কাছে না থাকলে কি ঘুম হয়?

বাড়ি যাওয়ার সময় লতিফের দোকানে একবার আসে আউয়াল। খানিকক্ষণ বসে যায়। গল্পগুজব করে। বেচাবিক্রির আলাপ। হাসি, বিড়ি খাওয়া।

আজ হাসতে-হাসতেই আসে আউয়াল। তারপর লতিফের দিকে তাকিয়ে বলে—কী কয় পাগলায়?

লতিফও হাসে। কয়, ও বলে এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি খাইতে পারবো। একঢোকও পানি খাইবো না। উডবো না।

হালায় একটা পাগলই। বলে ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে আউয়াল। লতিফকে দেয় একখান, নিজে নেয়। তারপর বিড়ি ধরিয়ে বেনচে বসে। ওই পাগলার পো, তর বাপে নি খাইছে কুনোদিন এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি!

তারপর আবার হাসে।

আউয়াল মানুষটা মন্দ না। ঠাট্টা-মশকরা পছন্দ করে। আর হাসতে। এজন্যে দোকানে গাহাক পড়ে বেশি আউয়ালের। দেখে অন্য দোকানিদের পোদ জ্বলে। হলে হবে কী, মুখে কেউ কিছু বলে না।

পবনা বলল, আমার বাপে পারতো পাচ সের খাইতে। এক বহায়। আমি হেই বাপের পোলা, আড়াই সের পারুম না! দিয়া দেহেন কত্তা, কেমনে খাই!

লতিফ বিরক্ত হয়ে বলল, আজাইরা প্যাচাইল পারিচ না পবনা। বয়। অন্য কতাবার্তা ক, আমার কাম আগগাইবো।

একথায় পবন একটু উদাস হয়। ফাঁকা, শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। তারপর গলা-খাঁকারি দিয়ে বলে, আমার বাপে আছিলো ডাকাইত। বিকরমপুরের বুড়া মাইনষের মুকে হুনবেন কেষ্ট ঠাকুরের নাম। মাইনষে কইতো কেষ্টা ডাকাইত। যাগ বয়েস পাঁচ কুড়ি ছয় কুড়ি। আমার বাপের নামে হেই আমলে গেরস্তরা গুমাইতো না। রাতে বিছানায় হুইয়া পোলাপান কানলে বউ-ঝিরা কইতো কেষ্টা আইলো। কেষ্টার নামে পোলাপানও ডরাইতো। কান্দন থামাইয়া গুমাইয়া পড়তো। গেরামে গেরামে দল বাইন্দা মাইনষে চকি দিতো। কেষ্টারে ঠেকাও। অইলে অইবো কি, কাম অইতো না। বাপে আমার ঠিক ওই মাইনষের মাতায় বাড়ি মারতো। সব্বশান্ত করতো। দিবেন নি কত্তা একখান আমিত্তি?

পবনার শেষ কথাটা কেউ গায়ে মাখে না। লতিফ মনোযোগ দিয়ে ঝাঁজরের ওপর আমৃত্তি তোলে। আউয়াল বিড়ি টানতে-টানতে বলে, তর বাপে আছিলো ডাকাইত।

মাইনষের মাতায় বাড়ি মাইরা টেকাপয়সা, মালসামান লইতো। আর তুই নেচ বিক্রা কইরা। বলে আবার সেই গাহাকভোলানো হাসি হাসে।

পবনা বলল, এইডা অইলো গিয়া কত্তা বরাতের খেইল। ডাকের কতা আছে না—চোর-ডাকাইতের গুষ্টির অন্ন জোটে না। আমার অইছে হেই দশা।

তারপর ফুরুক করে মুখের ভেতর লালা টানে। কত্তা, দিবেন নি একখান। পেট্টা পুইরা গেলো।

লতিফ কথা বলে না। বলে আউয়াল, ওই পবনা, পারবি তুই আড়াই সের আমিত্তি খাইতে? এক বহায়?

কন কী কত্তা? পারুম, হাচাই পারুম। দিয়া দেহেন না।

যদি না পারচ?

না পারলে আপেনেরা বিচার করবেন।

কী বিচার করুম?

যা আপেনেগ মন লয়।

আউয়াল মানুষটা আমুদে। পবনার কথায় হঠাৎ ভারি ফুরতি হয় তার। যদি তুই এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি খাইতে পারচ, আমিত্তির দাম তো আমি দিমুঐ আবার কাইল থনে আমার দোকানে তর খাওন-থাকন ফিরি। যতোদিন তুই বাচবি। আর যদি না পারচ তাইলে এই বাজার থনে আইজই তরে বাইর কইরা দিমু। কুনদিন এহেনে আইতে পারবি না। ক, রাজি আছচ নি?

পবনা ফুর্তিতে ঘাড় কাত করে। ফুরুক করে মুখের ভেতর লালা টেনে নেয় আবার। এক বহায় তো খামুঐ। একঢোকও পানি খামু না। উড়ুমও না।

লতিফ এসব কথা খেয়াল করছিল না। আধমন মিষ্টির অর্ডার। ষাট-সত্তর টাকার কাজ। ওই একটা চিন্তায়ই সে মগ্ন। দিন বুঝি তার বদলায়।

আউয়াল বলল, হুনছো নি লতিফ?

লতিফ আনমনে বলল, কী?

পবনা যদি এক বহায় আড়াই সের আমিত্তি খাইতে পারে, তয় আমিত্তির দাম তো আমি দিমুঐ, আবার কাইল থনে আমার দোকানে অর থাকন খাওন ফিরি।

আউয়াল মৃদু হেসে বলল, কী কচ পবনা?

হাচাঐ কই কত্তা। দিয়া দেহেন না।

আউয়ালের কেন যে এত উৎসাহ। বলল, খাড়া, মানুষজন ডাক দেই। বলেই চেঁচিয়ে আশপাশের দোকানিদের ডাকে। ও মিয়ারা, আহেন ইদিকে। কাম আছে।

শুনে লতিফ হাসে। আর ভেতরে-ভেতরে খুব খুশি। আরো আড়াই সের আমিত্তি বুঝি বিক্রি হয়। দশ-বারো টাকার কাজ।

আউয়ালের হাঁকডাকে দু-তিনজন আজার দোকানদার এসে জোটে। কী অইলো আউয়াল মিয়া?

আউয়াল মহাফুর্তিতে ঘটনাটা বলে। শুনে কাশেম বলল, কী কচ পবনা? হাচাঐ পারবি? নাইলে বুজিচ বাজার ছাড়তে অইবো। এহেনে আর কুনদিন আইতে পারবি না।

পবনা খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। আমি কি আপনেগ লগে মশকরা করতাছি নি?

এবার কথা বলে লতিফ। বুইজ্জা দেক পবনা, আড়াই সের আমিত্তি এক বহায় খাওন খেলা কতা না।

পবন বলল, আমি বুইজ্জাঐ কইতাছি।

আউয়াল বলল, আবার বোজ।

বুজছি, বুজছি, দিয়া দেহেন।

এবার উত্তেজনা বেড়ে যায় আউয়ালের। লতিফের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলে, আড়াই সের আমিত্তি মাইপা দেও, লতিফ। টেকা আমি দিমু।

লতিফ তো মহাখুশি। তবুও মুখে কী একটা বলতে যায়, তাকে থামায় কাশেম।

তোমার কী লতিফ বাই, দেও। ইট্টু কষ্ট কইরা আড়াই সের আমিত্তি বেশি বানাইবা।

দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে লতিফ বলল, আমার অসুবিদা নাই। মালসামান আছে। আদাঘন্টার খাটনি। আমি চিন্তা করি পাগলার লেইগা।

পবনা বলল, আমার লেইগা আপনের কুনো চিন্তা নাই, কত্তা। আপনে আমিত্তি বানান আর দেহেন পাগলায় কেমনে বেবাকটি খায়।

দুপোলায় সোয়াসের করে গরম আমিত্তি মেপে, একটা মাটির খাদায় ঢেলে পবনকে দেয় লতিফ। তারপর হাসে, অহনও টেইম আছে, পবনা।

পবনার তখন দিকবিদিকের খেয়াল নেই। হাতের সামনে গরমাগরম আড়াই সের আমিত্তি। সবগুলোই তার। একলা খাবে। কতকালের সাধ। সাধ পুরণের যে

কী সুখ, পবনা ছাড়া পৃথিবীর আর কে তা এই মুহূর্তে জানে!

প্রথম আমিত্তিটা মুখে দিয়ে পবনা বলল, আহা কী সোয়াদ গো কত্তা। আইজ রাইতে আপনের দোকানে জ্বীন-পরী আইবোই।

একথায় লতিফ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বাপের মুখে শুনেছিল, খাঁটি মিষ্টি নিতে পরীস্তান থেকে জ্বীন-পরী আসে গভীর রাতে। দোকানের বেবাক মিষ্টি নিয়ে যায়। যত হাঁড়ি মিষ্টি নেয়, টাকা দেয় তত হাঁড়ি। ভাগ্যকুলের কালাচাঁদ একরাতে সাত হাঁড়ি টাকা পেয়েছিল। সেই টাকায় কালাচাঁদ এখন মহা ধনী। কলিকাতায় শয়ে-শয়ে মিষ্টির দোকান তার। বাড়ি, গাড়ি।

লতিফ ভাবে, আইজ রাইতে যদি হাচাঐ জ্বীন-পরি আহে আমার দোকানে। যদি আদামোন আমিত্তি লইয়া আদামোন টেকা দেয়! ইশ, তাইলে আর কতা নাই। দিন বদলাইয়া যাইবো।

গপাগপ দশ-বারোটা আমিত্তি খেয়ে পবনা বলল, বেশি খাওন সামনে থাকলে আমার আবার ইট্টু প্যাচাইল পারতে অয়, বুজলেন নি কত্তারা। আপনেরা আইজ্জা করলে কই।

আউয়াল বিড়ি ধরিয়ে বলল, ক। তয় বুজিচ, বেবাক কইলাম খাইতে অইবো। ওকাল-পাকাল করতে পারবি না।

পবনা হাসে। দেহেন না কত্তা, কেমনে খাই। তারপর আর-একটা আমিত্তি মুখে দেয়। একবার আমার বাপে গেছে চরে ডাকাতি করতে। আমি তহন পোলাপান। সাত-আষ্ট বছর বয়সে। আমাগ বাড়ি আছিলো কোরাটি গেরামে। পদ্মার পারে। অহন আর কোরাটির নামগন্ধ নাই। পদ্মায় ভাইঙা গেছে। তয় আমি করতাম কী, হারাদিন গাঙপার পইরা থাকতাম। মায় আমারে গাঙপার থনে দইরা আইনা বাত-পানি খাওয়ায়।

পবনা আরেকটা আমিত্তি মুখে দেয়। ততক্ষণে আরো দু-চারজন দোকানদার এসে ভিড় করেছে লতিফের দোকানের সামনে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বেনচে বসে। সবাই হাঁ করে দেখছে পবনাকে। পবনার পাশে কুত্তাটা। আমিত্তির লোভ তারও আছে। এর মধ্যেই বার দুয়েক ঘেউ দিয়ে ফেলেছে সে। কী ঠাকুর, আমারে ইট্টু দিবা না!

পবনা খেয়াল করে নি। সুখের সময় কে কার কথা মনে রাখে!

আমিত্তি চিবাতে-চিবাতে পবনা বলল, বাজানে গেছে চরে ডাকাতি করতে—সাতদিন চইলা যায়, ফিরে না। কোনো সম্বাত নাই। গাঙপার আটতে-আটতে আমার খালি বাজানের কতা মনে অয়। কাঁসার বাসনে বাত বাইরা দিলে মারে আমি জিগাই, বাজানে আহে না ক্যা মা?

মায় কয়, আইবো। বড়ো কামে গেছে।

তয় বাজানে কলম কুনোদিন ডাকাতি করতে গিয়া দুই দিনের বেশি দেরি করতো না। হেই কতা ভাইবা মনডা কেমুন করে আমার। অইলে অইবো কী, পোলা-পান মানুষ, মারে বেশি কতা জিগাইতে পারি না। রাইত-বিরাইত জাইগা হুনি আন্দার গরে মায় জানি কার লগে কতাবার্তা কয়। বিয়ানে কেঐরে দেহি না। মারে জিগাইলে কয়, আমি গুমের তালে কতা কই।

আবার তিন-চারটা আমিত্তি খায় পবনা। ততক্ষণে বিকেল ফুরিয়ে গেছে। পদ্মার হাওয়ার সঙ্গে উড়ে-উড়ে আসছে অন্ধকার। দোকানে-দোকানে জ্বলে উঠেছে হ্যারিকেন, হ্যাজাগবাতি। লতিফ ময়রাও যে কোন্ ফাঁকে পুরোনো কালের জণ্ডধরা হ্যাজাগটা পাম্প করে, তেল ভরে, কাঁচ পরিষ্কার করে—ম্যানটেলে আগুন দিয়েছে, কেউ খেয়াল করে নি। হ্যাজাগটা এখন মিষ্টির আলমারির সঙ্গে বসে জ্বলছে। কী আওয়াজ তার। শোঁ-শোঁ। সেই আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে আসছে আগরবাতির গন্ধ। সন্ধেবেলা দোকানে আগরবাতি জ্বালায় লতিফ। আজ সতেরো-আঠারো বছর। যে ধর্মের যে রীতি। হিন্দুরা দেয় ধূপ, মুসলমানরা আগরবাতি। যাবতীয় সুগন্ধই বুঝি পবিত্র!

হ্যাজাক জ্বালিয়ে লতিফ আবার বসেছে চুলার পাড়ে। মনোযোগ দিয়ে আমিত্তি তুলছে। পবনার চার-পাশের ভিড়টা একটুও নড়ে নি। দোকানিদের কতো কাজ থাকে সন্ধেবেলা, আজ সেসব কাজের কথা কারো মনে নেই। হ্যাজাগের দিকে তাকিয়ে আবার দুখানা আমিত্তি খায় পবনা—ছয় দিনের দিন নিশিরাইতে গুমের তালে আমি হুনি কী, কই জানি—বহুত দূরে, কী একখান পইক ডাকতাছে। কু কু। হুইনা আমার বুকের বিতরে কেমুন জানি করে। পোলাপান মানুষ তো, কিচ্ছু বুজি

না। বিয়ানে উইট্টা দেহি মনে নাই কিছু। পরাদিন দুই-ফর বেলা, আমি আর মায় বইয়া রইছি দাওয়ায়, এমুন টেইমে একজন অচিন মানুষ আইলো। মাতায় তার আড়াই-সেইরা একখান মাইট্টা পাইলা। নতুন। মুখখান আবার বাঁশকাগজ দিয়া বান্দা। দেকলে মনে অয় মিষ্টি মাতায় লইয়া বিয়ার চলনে যাইতাছে। আমি চাইয়া-চাইয়া মানুষটারে দেহি। হেয় দেহি আমাগ বাইতঐ আহে। দেইক্কা আমি আর আমদে বাচি না। আমাগ কুনো সজন আইলো নি। মেলাদিন বাদে আইলো দেইক্কা বুজি মিষ্টি লইয়া আইছে। মিষ্টির মইদ্যে আমিত্তি অইলো আমার জান-পরান। পাইলা দেইখা আমার লোল পইরা যায়। আহা আইজ পেট বইরা আমিত্তি খামু। কুনোদিন তো ভরপেট আমিত্তি খাই নাই। দুই-চাইরখান খাইছি। পেডের কোনাও ভরে নাই।

আউয়াল বলল, ওই, পবনা খাচ না? অহনো তো একসেরও খাইতে পারচ নাই। বেবাকটি যদি না পারচ তাইলে বুজিচ। আইজই পিডাইয়া বাজরা থনে খেদামু।

লোকে বোঝে, আড়াই সের আমিত্তির দাম দিতে অইবো, আবার কাইল থনে পবনার থাকন-খাওন, জেদের চোটে কাজটা করেছে আউয়াল। সেই রাগে ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছে এখন। দেখে অন্য দোকানিরা খুশি হয়। ভালা হোগামারানী খাইছে হালায়। পয়সার গরম বোজ অহন।

লতিফ মনে-মনে হাসে। হোগায় গুরা কিরামি অইলে এমুনঐ অয়।

কথা বলতে-বলতে পবনা একটু আনমনা হয়েছিল। আউয়ালের খাঁকানিতে আমিত্তির কথা মনে পড়ে। আবার নতুন করে খাওয়ার লোভটা হয়। এক থাবায় দু-তিনটে আমিত্তি তোলে পবনা। মুখে দেয়। এইভাবে চার-পাঁচবার। দেখে ভিড়টা হল্লাচ্চেয়া করে ওঠে—এইবার পবনা ওকাল করবো।

শুনে গর্জে ওঠে আউয়াল। লতিফের দোকানের ঝাঁপ ঠিকনা দেয়ার বাঁশটা আঁকড়ে ধরে, ওকাল করলেই পিডান আরম্ভ করুম।

পবনা সেসব খেয়াল করে না। আমিত্তির স্বাদ মুখে দিয়ে খাঁক-খাঁক করে হাসে। চেইতেন না কত্তা। বহেন আর দেহেন। তয় আমারে ইট্টু কতাবার্তা কওনের টেইম দিতে অইবো।

আউয়াল বলল, হেইডা তো দিচ্ছিএই।

পবনা আবার দুটো আমিত্তি খায়—মানুষডা করল কী, বুজলেন নি কত্তারা, পাইল্লাখান মার পার সামনে নামাইয়া ইট্টু খাড়ায়। খরালি কাল আছিলো। কত্তার চুলার লাহান গরম অইয়া গেছে দুনিয়া। মানুষডা গাইষ্মা-চুইষ্মা সারা। মাজায় বান্দা আছিলো লাল এক-খান গামছা। খুইল্লা মোক পোছে। চেহারাখান কী তার —দেকলে ভয় করে। মাতায় বাবরি চুল। মোকে খাসির লাহান কালা মোচদাড়ি। চক্কু দুইখান শোলমাচের পোনার লাহান লাল। কইলো, ওস্তাদ আপনের লেইগা মিষ্টি পাডাইছে। হেয় আইবো সাতদিন বাদে। হুইনা মায় আমার কুনো কতা কয় না। মানুষডা কুনদিকে যে চইলা যায়, আর দেহি না। তয় আমার তহন কুনোদিকে খেল নাই। মায় যেমুন বইয়া রইছিলো, তেমুনই বইয়া থাকে দেইখা আমার পরানডা আইটাই করে। পাইল্লাডা খোলে না ক্যান মায়! বইয়া রইছে ক্যা! মোক দিয়া আবার লোল পড়ে আমার। সইতে না পাইরা কাগজ ছেঁদা কইরা ভিতরে আত দেই। হায়-হায়, আত দিয়া দেহি কী, মিষ্টি কৌ! আতে দেহি বেতকাডার লাহান কী বিন্দে। উকি দিয়া দেহি কী, হায়-হায়, মিষ্টির নামে হারে বাইশ-পাইল্লার মইদ্যে বাজানের কল্লাডা।

বাজানের মাতার চুল আছিলো কুন্ডি-কুন্ডি। বেত-কাডার লাহান খাড়াখাড়া। মোকভরা মোদদাড়ি। গায়ের রঙখান আছিলো চুলার ছাইয়ের লাহান। আন্দারে বাজানের চক্কু দুইডা ছাড়া আর কিছু দেহা যাইতো না।

পাইল্লার মইদ্যে বাজানের কল্লাডা দেইক্কা, আমি পোলাপান মানুষ কিচ্ছু বুজি না। মারে কই—মাগো পাইল্লার মইদ্যে দিহি বাজানের মাতাডা।

কী কচ? মায় আমার পাইল্লার মইদ্যে ফালাইয়া পড়ে। তার বাদে চিক্কইর মাইরা অজ্ঞেন। বুজলেন নি কত্তারা, মায় অজ্ঞেন অইয়া গেলো। হেইয়া দেইক্কা আমি চিইক্কর আরম্ভ করি। আমার চিইক্করে পড়শিরা দরাইয়া আহে। ওই পবনা, কী অইছে রে?

আমি কিচ্ছু বুজি না। কী কমু। পড়শিরা বাজানের কল্লাডা বাইর করে। তার বাদে হারা গেরামের মানুষ আইয়া ওডে আমাগ বাইতে। আসলে অইছিলো কী বুজলেন নি কত্তারা, চরে ডাকাতি করতে গিয়া ডাকাতির মাল-সামান লইয়া সার্কারদগ লগে কাইজ্জা

লাগে বাজানের। হের লগের মাইনষেঐ হেরে মারে। তার বাদে কাইল্লাডা কাইট্টা আত্মীয়র বাইত মিষ্টি পাডানোর লাহান আমাগ বাইত পাডাইয়া দেয়।

পবনা আবার দু-তিনটে আমিত্তি খায়। লোকজনেরা নিজেদের মধ্যে কী-কী সব কতাবার্তা কয়, পবনার কথা শোনে কি না শোনে, বোঝা যায় না। কেবল পবনা আড়াই সের আমিত্তি খেতে পারবে কি পারবে না, তাই নিয়ে কথা।

আউয়াল দেখে অর্ধেকের বেশি আমিত্তি খেয়ে ফেলছে পবনা। বাকি অর্ধেকও বুঝি খেয়ে ফেলবে। যেভাবে কথা বলে আর খায়—বেজায় লোকসান হয়ে গেল আউয়ালের। কেন যে চালাকি করে আগে সময় বেঁধে দেয় নি। এখন পবনা যদি সারারাত বসে আস্তে-ধীরে খায় আর কথা বলে! একথা ভেবে ভাবনায় পড়ে যায় আউয়াল। পবনা যদি সারারাত বসে খায় তাহলে তো তারও সারারাত বসে থাকতে হবে। ওইদিকে নতুন বউ বিছানায় শুয়ে সারারাত এপাশ-ওপাশ করবে। সকাল-বেলাও বাড়ি ফেরা যাবে না। দোকান। যেতে-যেতে কাল সন্ধ্যা। তখন বউ থাকবে মুখ ভার করে। কথাই বলবে না। তার ওপর নতুন বউর শরীরের স্বাদ। আহা, দুনিয়ার যাবতীয় মিষ্টি দ্রব্যের চেয়েও মিষ্টি। সেই কথা ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যায় আউয়ালের। খেপাঁকিয়ে বলে, ওই পবনা, হাবিরে কর। তর লেইগা কি হারা রাইত বইয়া থাকুম নি!

একথায় পবনা একটু ব্যাজার হয়। এমুন কলম কতা নাই, কত্তা। আমি কইছি এক বহায় খামু। বান্দা টেইম দেই নাই। আপনে খালি দেককেন, আমি না খাইয়া উডি নি। তাইলে যা মনে লয় করবেন।

লতিফ ততক্ষণে ছ-সাত সের আমিত্তি ভেজে শেষ করেছে। মাটির ঝাঁজরটা এখন আমিত্তিতে ভরা। না সরালে পরের খোলা নামাবে কোথায়?

এই ভেবে লতিফ তার টিনের দাঁড়িপাল্লা টেনে নেয়। গামছা দিয়ে মোছে। তারপর সোয়াসের ওজনের দুখানা বাটখারা একপাল্লা, আরেক পাল্লায় আমিত্তি মেপে নতুন পাতিলে রাখতে থাকে। এক-একটায় দুপাল্লা করে। মাপতে-মাপতে বাইরেও চোখ রাখে। বাইরে আড়াই সেরের কারবার। আট-ন টাকার কাজ। কথাটা ভেবে ভেতরে খুশিতে মরে যায় লতিফ। আইজ সবকিছু কেমুন জানি লাগে। বিয়ানে পাইলাম আদামোন আমিত্তির গাহাক। বিয়ালে আড়াই সের। নিশিরাইতে ভাইগ্যাকুলের কালাচান্দের দোকানের লাহান আমার দোকানে আইজ জব্বীন-পরী আইবো না তো। আদামোন আমিত্তি লইয়া আদামোন টেকা যদি দেয়। হায় হায়রে, তাইলে আর কতা নাই! দিন বদলাইয়া যাইবো।

দিনবদলের চিন্তায় মগ্ন থাকে লতিফ। বাইরে কে কী বলে, পবনা কতটা আমিত্তি খায় না খায়, খেয়াল করে না। পবনার কথায় চুপ করে আছে আউয়াল। নিজের দোষে নিজে ফেঁসেছে। কিছু বলার নেই। তবুও তেজি গলায় বলে, বাইত যামু না বেডা!

পবনা হাসে। যাইয়েন নে। বহেন, হপায় তো হাজ অইলো। তারপর আবার আমিত্তি মুখে দেয়। ঘজঘজ করে আমিত্তি চিবায় আর কথা বলে.....বাজানে তো মরলো। হেই দুখে আমি আর বাইত থনে বাইর অই না। খালি চিন্তা করি, মাইনষে মইরা যায় কই! ফিরত আহে না ক্যান!

তয় একথান কতা কী, মারে দেহি আগের চাইয়া যেমুন বেশি আশিখুশি। পোলাপান মানুষ তো, বুঝি না ক্যান। রাইতে আন্দার গরে হুইয়া ফুসুর-ফাসুর মাইনষের কতা হুনি। বেডামাইনষের গলা। কেডা আহে রাইতে আন্দার গরে। মায় তার লগে কী এতো কতা কয়? অইলে অইবো কি, বেশি পুচপাচ করন যায় না। আমি পোলাপান মানুষ—জিগাইলে মায় কয়, তুই সপন দেহচ। আর নইলে আমি যে গুমের তালে কতা কই, হেই হুনচ। হায় ভগবান।

তার বাদে অইলো কী, বুজলেন নি কত্তারা। এক-দিন নিশিরাইতে অইছে কী—আমি গুমের মইদ্যে হুনি কই জানি বহুত দূরে হেই পইকটা আবার ডাকতেছে। কু কু। হেই ডাকে আমার নিদ ছুইটা যায়। আর ডর করে। আন্দারে আইত্তাই—মা, মাগো। মার কুনো হদিশ পাই না। এই ঘটঘুইট্টা আন্দারে মায় গেলো কই! তার বাদে মালুম করি পেশাপ-পাইখানা ফিরতে গেছে। আইবো নে। আবার গুমাইয়া যাই। একগুমে রাইত পার। মাইনষে কয় না কালগুম—হেই কালগুম, বুজলেন নি কত্তারা। বিয়ানে উইট্টা দেহি, মায় তো আমার কুনো-হানে নাই। হারা বাইত বিচরাই। নাই। পাড়া বইরা

বিচরাই, গেরাম বইরা বিচরাই—নাই। হেষমেষ যাই দাইমার বাড়ি। হেয়ও আমার লগে বিচরায়। নাই।

দাইমার আছিলো এক মাইয়া, হরিদাসী। আমার লাহান বয়সে। দাইমার পতি চিতায় গেছে একখান ঘোড়া রাইখা। সেই ঘোড়াখান বেলদারগ কাছে বর্গা দিয়া, মাইয়া লইয়া দুইবেলার অন্ন জোটে দাইমার। এমুন মানুষ। হেয় আমি আর হরিদাসী মিইল্লা বেবাক জাগায় মারে বিচরাই। সম্বাত নাই। আমি পোলাপান মানুষ, বিয়াল অইয়া যায়—মারে না দেইক্কা আমি চিইক্কর পারি। হেই দেইক্কা দাইমায় আমারে তাগো বাইত লইয়া গেলো। বুজলেন নি কত্তারা, তার বাদে কতো দিন গেলো আইলো, মায় আর আইলো না। বয়েসকালে বুজি, মার একখান পিরিতের মানুষ আছিলো। রাইতে বাজান থাকতো না বাইত, হেই মানুষখান আইয়া মার লগে কতাবাত্তা কইতো। বাজানে বাইচা থাকতে হের ডরে পলাইতে পারে নাই। কেষ্টা ডাকাইতের গরের বউ লইয়া পলাইবো, এমুন ক্ষেমতা কুন মাইনষের আছে! তয় পলাইলো, বাজানে মইরা যাওনের পর। আমারে একলা থুইয়া......

পবনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর আস্ত একখানা আমৃত্তি মুখে দিয়ে উদাস হয়ে চিবায়। কুত্তাটা, কুত্তাদের চিরকালীন ভঙ্গিতে তখনো পবনার পাশে বসা। অবাক হয়ে প্রভুকে দেখছে। প্রভু যে আজ তাকে না দিয়ে একলাই খায়! কী কারণ? মানুষের সব আচরণ বোঝে না সে। মানুষ জাতটা বড়ো অদ্ভুত। কুত্তাদের মতো উদার না। কুত্তাটা কেবল এই কথা ভাবে।

ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। বাজারের ঠিক উপরে ফুটে উঠেছে কাটা বাঙির মতো চাঁদ। তার ম্লান একটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বাজারের শাদা মাটিতে। পদ্মার হাওয়াটা আছেই। বাজারের ওপর ঘুরে-ঘুরে আমৃত্তি ভাজার গন্ধ আর চাঁদের আলোর মিশেল দিচ্ছে এখন।

আমৃত্তি চিবাতে-চিবাতে গলাখাঁকারি দেয় পবনা... বুজলেন নি কত্তারা, আমি তার বাদে দাইমার বাইতই থাকি। নিজের মাইয়ারে আর আমারে এক রহমই সোয়াগ-আল্লাদ করে দাইমায়। রাইতে হোয়ায় তার লগে। অইলে অইবো কী, মার কতা কলম আমি ভুলি নি। যহন-তহন মনডা কান্দে। পরানডা কান্দে। আর দিন যায়। শইলখান আমার বাজানের লাহানঐ জুয়ানতাগড়া অইতে থাকে। হেই দেইখা দাইমায় একদিন কয়, অই পবনা, জুয়ান-মদ্দ তো অইয়া গেলি, কামকাইজ কর। বিয়া-সাদি কর। আমি আর কয়দিন। আপনা পেডেরডা তো আছেই, তুইও অহন আপনাঐ। তগো বেবস্তা না কইরা চিতায় উডুম কেমনে।

কাম-কাইজের কতাডা বালাই, বিয়াসাদির কতা, বুজলেন না কত্তারা, হুইনা আমার লাজ করে। কই, কী কাম করুম! বাজানের লাহান চুরি-ডাকাতি!

হেই হুইনা দাইমায় আমারে মুইরা পিছা লইয়াহে পিডাইতে। চুরিডাকাতি করনের লেইগা তরে পালছি, অ্যাঁ গোলামের পো!

দাইমারে আমি বহুত ডরাইতাম। কই, তয় তুমি কও কী কাম করুম! দাইমায় আর কতা কয় না। পরদিন বেলদারগ থনে ঘোড়াডা ফিরাইয়া আনে। ঘোড়াডার নাম আছিলো পঙ্খিরাজ। আইনা দাইমায় কয়, ল এই ঘোড়া দিলাম। এইডা লইয়া আটবার গোয়ালীমান্দ্রা যাবি, দিগলী যাবি। ধান-চাইল টানবি, গেরস্তর সবজি টানবি, আমরা তিনজন মানুষ, দিন চইলা যাইবো।

হরিদাসী তহন ডাঙার অইয়া গেছে। জোলাগো কাপড় পিন্দা চলে। আর খালি আসে, খালি আসে। আমারে দেইখাও লাজ করে। হেই দেইক্কা, বুজলেন নি কত্তারা—দাইমায় হরিদাসীর লগেই আমারে...

কথাটা শেষ করে না পবনা। পাগল-ছাগল মানুষ, তবুও লাজ-লজ্জা আছে। তাই দেখে লোকজন হাসে। আমৃত্তি ভাজতে-ভাজতে লতিফ বলে, কইয়া হালা পবনা, হরিদাসীর লগে আদম খেল খেলনের বেস্তা কইরা দিলো।

শুনে হাসির রোল পড়ে যায়। পবনা কথা বলে না। আমৃত্তির থাদার দিকে তাকায়। তাকিয়ে খুশি হয়। পেরায় খতম অইয়া আইছে। আর তিন সাড়ে তিন গনডা অইবো আছে। পেডের তো অহনও কিছু অয় নাই আমার। আহা, কী সুখ গো! আউয়াল কত্তায় কইছে কাইল থনে হের দোকানে থাকন-খাওন ফিরি। আমারে আর পায় কোন্ হালায়!

সুখের কথা ভাবে আর গাপগুপ আমৃত্তি মুখে দেয় পবনা...পঙ্খিরাজ আছিলো হরিদাসীর বাপের আমলের। বেলদারগ কাছে বর্গা আছিলো। হালায় বেলদারের পোরা জবর খাডাইতো পঙ্খিরাজরে। আমরত্ত বাইর কইরা হালাইতো ধান-চাইল টানাইতে-টানাইতে। পঙ্খিরাজরে পয়লা দিন দেইক্কাই আমার এমুন মায়া লাগল, কী কমু কত্তারা। বিলে ছাইরা আইট কইরা খাওয়াইলাম কয়দিন। দেহি, হ পঙ্খিরাজ ঝাড়া দিয়া উডছে। তার বাদে শুরু করলাম কাম। গোয়ালীমান্দ্রার আডে যাই, দিগলীর আডে যাই। আডবার না থাকলে যাই অইলদার বাজারে, আয়-বরকত ভালাই অয়। দিন চইলা যায়।

তয় আমি কইলাম কত্তারা, পঙ্খিরাজরে জবর সোয়াগ করতাম। হারাদিন কাম কইরা রাইতে দিতাম বিলে ছাইরা। পঙ্খিরাজ আছিলো আমার খুব বাদুক। বিয়ানে রইদ উডোনের আগেই বাইত আইয়া পড়তো। আবার কামে যাও। পেডের ধান্দা অইলো বড়ো ধান্দা।

তয় পঙ্খিরাজরে কলম হরিদাসী দেকতে পারতো না। কইতো এইডা অইলো আমার হতিন। এই ফাঁকে আরেকখান কতা কই কত্তারা, যেদিনই আডে-বাজারে যাইতাম, বাইত আহনের টেইমে আমি কলম একখান দুইখান আমিত্তি কিন্না খাইতাম। আমিত্তি খাওনের লোবডা আমার যে কেমুন, হেইডা আপনেরা বুজবেন না। বাজানের কল্লাডা যেদিন মিষ্টির পাইল্লার লাহান আমাগো বাইত আইলো, ওইদিন যেই লোকটা আইছিলো, আহা আইজ পেড বইরা আমিত্তি খামু—হেই লোবডা আর যায় নাই। অহনও আছে। মাইনষে কয় না, ভগমান মাইনষের বেবাক আশা পূরণ না করলেও দুই-একখান করে। আমার আমিত্তি খাওনের আশাডা কইলাম পূরণ অইয়া গেলো। এই যে আইজ। ইচ্ছামতন খাইতাছি। পেড বইরা। বলেই পবনা আবার আমৃত্তি মুখে দেয়। তাই দেখে আউয়ালের মুখে মরা বটপাতার রঙ ধরে। আদতেই তো হালায় বেবাকটি খাইয়া হালাইবো। আর তো আছে পাঁচ-ছয়খান। ঈশ রে, কী কামডা করলাম। কতোডি টাকা লোকসান। আবার কাইল থনে পাগলার থাকন-খাওন দিতে অইবো। ঘাইরামি করলে বদলাম।

নিজের ওপর রাগে জ্বলে যায় আউয়াল।

কাশেম বলল, হ বুজছি, বেবাকটিই খাইবো হালায়। তারপর পবনাকে বলে, একটানে খাইয়া হালা পবনা, দেইক্কা দোকানে যাই।

লতিফ বলল, আর কী দেকবা। যাও। ওই তো আর কয়খান। ধীরে-সুস্তে খাউক।

আউয়াল মনে-মনে বলে, তোমার কী চোদানির পো। খালি মাইনষের হোগা মারনের তালে থাকো। মুখে এসব কথা বলা যায় না। আউয়াল আবার বিড়ি ধরায়। তারপর চাঁদের ম্লান আলো আর পদ্মার হাওয়ার ওপর ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে শোনে...বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হরিদাসী গেল পোয়াতী অইয়া। হেই দেইক্কা আমি হারাদিন পঙ্খিরাজরে লইয়া আডে বাজারে পইরা থাকি। আমিত্তি খাওন ছাইরা দেই। খাওনের মুক বাড়তাছে। আয় না বাড়লে কেমনে চলবো। দাইমায়ও হেই কতাই কয়। ভালা কইরা কাম-কাইজ কর। পোলাপান অইলে খরচা আছে। খালি হরিদাসী কয়, এতো কাম কইরো না। নিজের জান-পরানডার খেল রাইখো। পবনা আবার একটা আমৃত্তি মুখে দেয়। মুখে দিয়েই টের পায়, পেটটা কেমন করে। বুকটা কেমন করে। হায় হায়, ওকাল পাকাল অইবো না তো! তাইলে সর্ব্বনাশ অইয়া যাইবো। আউয়াল কত্তায় অহনই বাশ দিয়া পিডাইবো। কাইল থনে এই বাজারে আর থাকন যাইবো না। তাইলে আমি যামু কই! যাওনের একখান জাগা আছিলো দাইমা, হেয় চিতায় উটছে একযোগে বারো বছর।

পবনা একটু নড়েচড়ে বসে। তাতে পেটটা একটু আরাম পায়। বুকটা একটু আরাম পায়।...একদিন রাইতে হরিদাসীর বেদনা উঠলো। বাইত আছিলো একখান গর। দাইমায় কইলো, ওই পবনা, তুই গিয়া গাচতলায় ব। এই টেইমে মরদরা গরে থাকে না।

উডানে আছিলো একখান রোয়াইল গাচ। আমি হেই গাচের লগে ঢেলান দিয়া বহি। নিশিরাইত। পঙ্খিরাজ গেছে বিলে। আসমানে চুনাকুমড়ার লাহান গোল একখান চান। চান্নি কী। ফকফক করে। মাইত্তে ফুঁ দিলে ধুলাবালি উড়তে দেহা যায়, এমুন। আমি গাচতলায় বইয়া-বইয়া বিড়ি টানি আর হুনি গরের মইদ্যে হরিদাসী আহুইজ্জা বেদনায় কোকায়। আমার কেন জানি পরানডা কান্দে। কেমুন জানি লাগে। এমুন টেইমে হুনি কি, বুজলেন নি কত্তারা—কই জানি, বহুত দূরে হেই পইকখান ডাকতেয়াছে। কু কু। হুইনা আমার পরানডা কান্দে। কেমুন লাগে।

বিয়ান অয় নাই, তহন দাইমায় চিইক্কর দিয়া উটলা। হায় হায় রে, কি সব্বনাস অইল গো...

আমি দরপাইরা গরে যাই। গিয়া দেহি হরিদাসী নিজে গেছে, পেডেরডাও লইয়া গেছে। দেইক্কা আমার

যে মাতার মইদ্যে একখান চক্কর মারলো, হেই চক্করডা আর কুনোদিন গেলো না। অহনও আছে।

পবনা তারপর আর কোনো কথা বলে না। উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী যে দেখে, কী যে ভাবে—কেউ জানে না।

খাদায় তখন একটা মাত্র আমুত্তি। দেখে আউয়াল উঠে দাঁড়ায়। মরা বটপাতার মতো মুখটা নিয়ে বলে, খাইয়া হালা পবনা। বাইত যামু। ম্যালা রাত অইলো।

কাশেম বলল, দেরি করচ ক্যা পবনা? খাইয়া হালা।

পবনার তখন পেটটা কেমন করে, বুকটা কেমন করে। এত কালের পুরোনো শরীরটা আর নিজের মনে হয় না। ভাবটা চেপে থাকে পবনা। মুখে খুব বিনীত-ভাবে বলে—কত্তারা, এইডা না খাইলাম। কুত্তাডা হারাদিন বইয়া রইলো, এইডা অরে দেই।

শুনে গর্জে ওঠে আউয়াল। বানড়ামি পাইছো বেডা হালা। খাও। নাইলে অহনই পিডামু।

পবনার আর কথা বলার মুখ থাকে না। মনে-মনে কুত্তাটার কাছে ক্ষমা চায় সে। ভাই রে, ক্ষেমা কইরো। তারপর শেষ আমুত্তিটা মুখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পবনা। দাঁড়িয়ে টের পায় এত কালের পুরোনো শরীরটা আর তার নিজের মধ্যে নেই। অচেনা হয়ে গেছে।

তখন ভিড়টা ভাঙছে। দোকানিরা পবনার গর্বে বুক ফুলিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কত পদের কথা তাদের। সাব্বাস পবনা বাপের নাম রাকছচ। পবনা এসবের কিছুই শোনে না। অচিন শরীরখান টেনে-টেনে, ভাঙা চাঁদের ম্লান আলো মাথায়, নদীর দিকে হেঁটে যায়। সেই সময় পৃথিবীর দূর কোনো প্রান্তে বসে কি সেই পাখিটা ডাকছিল! কু কু!

পরদিন সকালে মাছচালার ধুলোবালি থেকে মুখ তুলে নেড়ি কুত্তাটা তার প্রভু পবন ঠাকুরকে খোঁজে। নেই। কুত্তাটা তারপর ওঠে। উঠে বাজারময় চক্কর খায়! প্রভুকে খোঁজে। নেই। প্রভু কোথাও নেই।

কুত্তাটা তারপর মন খারাপ করে নদীতীরে যায়। সেখানে জেলেদের দু-তিনখান নাও ডাঙায় উপুড় করে রাখা। মেরামত হবে। আলকাতরা মাইটা তেল খেয়ে আবার জলে নামবে।

কুত্তাটা দেখে দুখানা নাওয়ের মাঝখানে মাটিতে, তার প্রভু পবন ঠাকুর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। দেখে কুত্তাটা দু-তিনবার ঘেউ দেয়। পবন ঠাকুর নড়ে না। কুত্তাটা কী বোঝে কে জানে, সে আর ঘেউ দেয় না। একটা নাওয়ের সামনে পা তুলে পেচ্ছাপ করে।

গ্রাহকদের প্রতি

যাঁদের চাঁদার মেয়াদ চৈত্র (এপ্রিল) মাসে শেষ হচ্ছে তাঁরা নতুন বছরের চাঁদা ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পাঠালে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়।

জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

গতিশীলতার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো মানবিক প্রতিষ্ঠানই অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। অনিবার্যভাবেই তাই গত একশো বছরে রাজনৈতিক দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের আকৃতি আর প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রারম্ভিক পর্বে কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণীর বৈঠকি রাজনীতির মঞ্চ। বিদেশী শাসকের দরবারে দোবারিকের নির্বিঘ্ন ভূমিকা লাভই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই কংগ্রেস-নায়কদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আধুনিক ভারতের নতুন দুর্যোধন বিনা সংগ্রামে রাজনৈতিক সুবিধার সূচ্যগ্র ভূমি দানেও নিতান্ত অনিচ্ছুক। অন্যদিকে আগ্রাসী শাসনে ক্লিষ্ট জনসাধারণের চেতনায় জাতীয়তাবাদের বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। ফলত কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নিরুত্তাপ আঙিনায় আবির্ভাব ঘটে চরমপন্থীদের, যাঁদের অন্যতম আদি প্রবক্তা ছিলেন বাল গঙ্গাধর টিলক। ইতিমধ্যে কারজনের বঙ্গ-ভঙ্গনীতি চরমপন্থী রাজনীতিকে উত্তাল করে তোলে এবং প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ জাতীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিতে নিয়ে আসে বিপুল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস রাজনীতি প্রবাহিত হতে থাকে নতুন খাতে। কাজেই যদিও ১৯১৬ সনের লখনউ অধিবেশনে নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের আনুষ্ঠানিক মিলন ঘটে, তবুও এই পর্বে কংগ্রেসের পক্ষে কার্যত আর পুরাতনী নরমপন্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯১৯ সনের জালিয়ানওয়ালাবাগ নৃশংসতায় এই সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর গণহত্যা দেশবাসীর মনে এমনই তীব্র ঘৃণা আর ধিক্কারের আবেগ সঞ্চারিত করে যে রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই কংগ্রেসের পক্ষে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের শামিল হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, বিশের দশকের শুরুতেই, ঘটনাপ্রবাহ কংগ্রেসকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে বাধ্য করে। কংগ্রেসের পরিচালনাধীন এই আন্দোলনকে সবল এবং সংহত রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত নেতৃত্বের, এবং এই নেতৃত্ব দিতে সঠিক ঐতিহাসিক মুহূর্তেই গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে কংগ্রেসের রাজনীতিতে।

গান্ধীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রচলিত কর্মধারায় দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন। একদিকে কংগ্রেসের পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে দেশবাসীর প্রতিবাদী আন্দোলন সুসংগঠিত আকার ধারণ করে। অন্যদিকে কংগ্রেসের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ক্রমশই এই আন্দোলনের শামিল হতে থাকেন সর্ব শ্রেণী আর সম্প্রদায়ের মানুষ। অর্থাৎ, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী ও স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিমুখী গণ-আন্দোলনের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে কংগ্রেস। রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের এই অসামান্য সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব এককভাবে গান্ধীর নেতৃত্বে আরোপ করলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হয়। আবার একথাও অস্বীকার করা যায় না যে দুই দশকের বেশি সময় ধরে কংগ্রেসের রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল গান্ধীর নেতৃত্বের দ্বারা এবং মূলত গান্ধীর অবদানেই কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি এবং কার্যক্রম বিশিষ্টতা অর্জন করে। এক কথায়, কংগ্রেস রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধীপর্ব সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়।

দুই

গান্ধী কংগ্রেসকে এক বিশিষ্ট গণসংগঠন তথা পরাধীন ভারতবাসীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি করে তুলতে পেরেছিলেন কতকগুলি অভিনব উপায় অবলম্বন করে। প্রথমত, তিনি ভারতীয় জীবনের সনাতনী ভাবধারাটিকে যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে সনাতনী মূল্যবোধের প্রতি সর্বশ্রেণীর মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ থাকে, এবং এই মূল্যবোধের মাপকাঠিতে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছে রাজৈশ্বর্যের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তপস্বীর কৃচ্ছ্রসাধন, আড়ম্বর এবং গরিমার চেয়ে অধিকতর প্রেয় দীনতা আর সরলতা। এই উপলব্ধির আলোকে তিনি ব্যক্তিগত জীবনচর্যাকে নিয়ন্ত্রিত করেন সহজ আভরণহীনতার অভ্যাসে, এবং এর ফলে জনমানসে শ্রদ্ধার স্থায়ী আসন লাভ করে তিনি এক অসামান্য গণমোহিনী শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। এই গণমোহিনী শক্তির সুদক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা নিশ্চিত করেন। দ্বিতীয়ত, গান্ধী অনুভব করেছিলেন যে প্রতিবাদী রাজনীতিকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে তা সর্বনাশা বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত, চৌরিচৌরার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে পশ্চাদপসরণ ঘটেছিল এই বিশ্বাসেরই ভিত্তিতে। এই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বে রাজনীতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটান ধর্ম, আধিবিদ্যক ভাবনা এবং নৈতিকতার। ফলত রাজনীতিকে তিনি উপস্থাপিত করেন মহত্তর এক জীবনাদর্শের অঙ্গীকার রূপে। এই অঙ্গীকারের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক সহচর তথা কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে তিনটি মন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। প্রথম মন্ত্র ছিল এই যে, রাজনীতি নিছক ক্ষমতাদখলের সংগ্রাম নয়। এর মধ্যে নিহিত আছে এক নৈতিক দায়িত্ব। এই মন্ত্র থেকে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিয়েছিল দ্বিতীয় মন্ত্র যে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে-কোনো উপায়ই গ্রহণযোগ্য নয়, উপায়ের নৈতিক গুণাগুণ অবশ্যই বিচার্য বিষয়। তৃতীয় মন্ত্রের মূল কথা ছিল এই যে, রাজনীতি চূড়ান্ত বিচারে জনসেবার প্রধান মাধ্যম, এবং এই জনসেবার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে রাজনীতি চরিত্রভ্রষ্ট হয়। এই তিন মন্ত্রের সম্মিলনে গান্ধী কংগ্রেসের জন্য এক অলিখিত অনুশাসন তৈরি করে দেন, এবং এই অনুশাসনের দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকে কংগ্রেসের কর্মকৌশল।

তৃতীয়ত, রাজনীতির রুটিনের মধ্যেও হার্দ মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে গান্ধী বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতোৎসারিত স্নেহ-ভালোবাসা কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে এমনই এক মমতার নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল যে কংগ্রেসের প্রতিটি নেতার কাছেই তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক অটুট ছিল বলেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাঁর রাজনৈতিক নীতি এবং কৌশল সম্পর্কে কখনও-কখনও তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত হলেও বিক্ষুব্ধেরা কখনই তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান জানাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। উল্লেখ্য যে, গান্ধীর অন্যায় নীতির প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন এবং গান্ধীর অনুক্ত সম্মতিতেই তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু গান্ধী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের সশ্রদ্ধ ভাব চিরদিনই অপরিবর্তিত ছিল। বস্তুত, দেশবাসী কখনও-কখনও রাজনীতিবিদ গান্ধীর নীতিতে

অবশ্যই বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবনদর্শনের স্বাভাবিক আকর্ষণে তাঁরা কখনই মানুষ-গান্ধীকে অশ্রদ্ধা করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক সুমিত সরকার জনসাধারণের ওপর গান্ধী-রাজনীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনসাধারণের গুজবপ্রবণতাকে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন (মডারন ইনডিয়া, পৃ ১৮১-৮৩)। তাঁর বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত জনসাধারণ ভিত্তিহীন গুজব আর কল্পনার ওপর নির্ভর করে গান্ধীকে ভেবেছিলেন এক সর্বদুঃখহর পরিত্রাতা রূপে। এর সরলার্থ এই যে, অশিক্ষিত দেশবাসীর অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে গান্ধী তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, শ্রী সরকার তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে মূলত নির্ভর করেছেন ১৯২১ সনের ব্রিটিশ সরকারের এক গোয়েন্দা-প্রতিবেদনের ওপর যার সত্যতা সংশয়াতীত নয়, এবং যা স্বাভাবিক কারণেই গান্ধী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার ভাবটিকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল। অশিক্ষিত জনসাধারণের গুজবপরায়ণতা এবং অতিমূল্যানুমানের প্রবণতা অবশ্যই অনস্বীকার্য, কিন্তু এই জনমনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে গান্ধীর কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না। কারণ গুজবপ্রবণতার তত্ত্ব মেনে নিলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে গান্ধী এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন এবং গত একশো বছরে অন্য কোনো কংগ্রেস নেতাই তা পারেন নি। গান্ধী এই ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন, অর্থাৎ পরিত্রাতার ভূমিকায় তিনি জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিলেন মূলত এই কারণে যে, তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কংগ্রেস দলের শক্তিবৃদ্ধিতে গান্ধীর চতুর্থ অবদান ছিল এই যে তিনি একদিকে যেমন রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করেছিলেন ব্যাপক গণসমর্থনের ভিত্তিতে, অন্যদিকে তেমনই কংগ্রেসের বিধিগত সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে পোক্ত করার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি নিজে তৈরি করেন কংগ্রেসের নতুন সংবিধান এবং এই সংবিধান অনুযায়ী এক অতি শক্তিশালী ওয়ারকিং কমিটি গঠন করে তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকরণপ্রক্রিয়াকে। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল এই যে, কংগ্রেসের শ্রেণীসমন্বিত রাজনৈতিক শক্তিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রায়িত সংগঠনব্যবস্থার।

এর অর্থ এই নয় যে, গান্ধী রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন সমস্ত মালিন্য, বিভ্রান্তি আর বিফলতা থেকে। বস্তুত, তাঁর নিজের কর্মপ্রণালীই এক অর্থে ছিল দলের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি কংগ্রেস দলের সিদ্ধান্তকরণ-প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত করে তিনি কংগ্রেস সংগঠনে কার্যত এক ধরনের ব্যক্তিগত স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ, গান্ধীকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস এমনই ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে ওঠে যে তাঁর অঙ্গুলিহেলনে কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ এক অতি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে ওঠে। ১৯৩৪ সনে গান্ধী কংগ্রেসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তথাপি চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়ত, গান্ধীর উপস্থিতি সত্ত্বেও কংগ্রেস দল অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিভেদের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারে নি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি স্বার্থগোষ্ঠী এবং সমনোভাবী গোষ্ঠী (অ্যাটিচুড গ্রুপ) সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস আর বোঝাপড়ার অভাব ক্রমশই প্রকট হতে থাকে। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশনের আগমনের সময় থেকে গান্ধীর কংগ্রেসী সহযোদ্ধাদের ক্রমশই ক্ষমতা আস্বাদনের ব্যগ্রতা দেখা দিতে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে মাউনটব্যাটেনের কৌশলী তৎপরতায় এই ব্যগ্রতা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে পরাধীনতার শেষ পর্বে গান্ধীর নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই উপেক্ষিত হয়। ভারতের স্বাধীনতালগ্ন যখন সমাসন্ন তখন গান্ধী কংগ্রেসের এক নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত প্রহরী।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও গান্ধী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের শক্তির প্রধান উৎস। এর পিছনে স্পষ্টতই কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, গান্ধী-পূর্ব অধ্যায়ে, রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে ছিল আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় প্রায়োগিক দল (প্র্যাগম্যাটিক পার্টি) যা মূলত ক্রিয়াশীল থাকে কর্মসূচীভিত্তিক দল হিসাবে। বস্তুত, স্পষ্ট কোনো

মতাদর্শের ভিত্তিতে কংগ্রেস দল গঠিত হয় নি। গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের দ্বারা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে তাকে উপহার দেন এক সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ যা কালক্রমে পরিচিত হয় গান্ধীবাদ নামে। মতাদর্শ হিসাবে গান্ধীবাদ কতদূর অভ্রান্ত এবং সফল, তা অবশ্যই বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে গান্ধীবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেস সংহত ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এই অর্থে যে, এই মতাদর্শ কংগ্রেসের বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা কার্যকর ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হয় এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকরণপ্রক্রিয়ায় ঐকমত্যলাভের পথ প্রশস্ত করে। অর্থাৎ, গান্ধীর দেওয়া মতাদর্শের ভিত্তিতেই কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসাবে স্থিতিক্ষমতা (ভায়েবিলিটি) লাভ করে। দ্বিতীয়ত, গান্ধী রাজনীতির লক্ষ্য এবং তা পূরণের উপায়—এই উভয়কেই নৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাজনীতিকে মেশাতে চেয়েছিলেন নৈতিকতার সঙ্গে। তাঁর এই প্রয়াস অনাধুনিক এবং রাজনীতির স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হলেও এর দ্বারা তিনি কংগ্রেসকে রেখেছিলেন নৈতিক শাসনে যাতে দলের কাজকর্মে কদাচারের অনুপ্রবেশ না ঘটে। এর ফলে জনমানসে কংগ্রেসের পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি গান্ধী কংগ্রেসকে যুক্ত করেছিলেন ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে। এর ফলে দেশের বহুহত জনগোষ্ঠীকে অনায়াসেই কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল।

তিন

স্বাভাবিক কারণেই তাই গান্ধীর অবর্তমানে কংগ্রেসের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়, এবং পঞ্চাশের দশক থেকে এই দুর্বলতা ক্রমশই প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৪৮ সনের তিরিশে জানুয়ারি দেশবাসীকে গান্ধীর মর্মান্তিক হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ দিতে গিয়ে শোকাহত নেহরু এই মন্তব্য করেছিলেন যে গান্ধীর জীবনাবসানে দেশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে অন্ধকার। এই তাৎক্ষণিক মন্তব্যে প্রকৃত-পক্ষে এক নির্মম সত্য নিহিত ছিল। কারণ গান্ধীর অবর্তমানে কংগ্রেস যে বিভ্রান্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় তা থেকে আজও এই দলটি মুক্ত হতে পারে নি। এই বিভ্রান্তি এই কারণে যে গান্ধী-উত্তর যুগে কংগ্রেস গান্ধী-রাজনীতির মূল দর্শনটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে গান্ধীর অনুসৃত কিছু কিছু কর্মপ্রণালী এবং রাজনৈতিক কৌশলকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে, এবং এর ফলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তির দুর্গপ্রাচীরে অসংখ্য ফাটল দেখা দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গান্ধী-উত্তর যুগে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতিতে গান্ধীপ্রবর্তিত ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসরণ করে চলেন নির্দ্বিধায়। একই সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপরিচালনব্যবস্থাতেও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার অভ্যাস প্রবল হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে প্রথম স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় গণপরিষদ গঠনের প্রাক্কালে। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে যখন গণপরিষদ গঠিত হয়, তখন এই পরিষদীয় নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যাপারে কংগ্রেস হাই কমানড সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন তাঁদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ওপর। গান্ধী অবশ্য তখনও জীবিত, তবে এ বিষয়ে তাঁর দায়িত্ব ছিল সামান্যই ; কারণ এই পর্বে কংগ্রেসের ক্ষমতার জগতে তিনি এক বিদায়ী সূর্য। এর পর গান্ধীর জীবনান্তে কংগ্রেসের ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা আরও নগ্নভাবে প্রকাশ পায় গণপরিষদের সিদ্ধান্তকরণপ্রক্রিয়ায়। নেহরু প্রমুখ কংগ্রেসের চারজন উচ্চসারির নেতা গণপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যত নিজেদের অমোঘ নিয়ন্ত্রণে রেখে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার এক ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেন।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মধারা এবং দলীয় রাষ্ট্র-শাসনপদ্ধতির বাকি ইতিহাস এই ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণেরই নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। বর্তমান ভারতবর্ষে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে বহুদূরের কোনো এক আঞ্চলিক সাংগঠনিক সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেসকর্মীরা আকুল হয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করেন। আজও কোনো এক নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কংগ্রেসের আঞ্চলিক শাখার বিচার-বিবেচনা এবং পছন্দ-অপছন্দ নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়, এ বিষয়ে একমাত্র নিয়ন্ত্রক শক্তি হল কেন্দ্রীয় সংগঠনের মতামত। এই ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি আরও একটি গান্ধী-

প্রবর্তিত পদ্ধতি গান্ধী-পরবর্তী যুগের কংগ্রেস বিশ্বস্ত-ভাবে অনুসরণ করেছে, এবং এটি হল রাজনীতিতে ব্যক্তিসর্বস্বতার ব্যাপক ব্যবহার। উল্লেখ্য যে নেহরু ও ইন্দিরা-পর্বে কংগ্রেস রাজনীতি চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে ওঠে। একদিকে কংগ্রেস হাই কমানড রূপান্তরিত হয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত একক কমানড এবং অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির মাধ্যমে বিচার করা হতে থাকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা। এর ফলে কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম এবং কংগ্রেস-পরিচালিত দেশের শাসনব্যবস্থায় অনিবার্য-ভাবে দেখা দেয় এক প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্রের পরিবেশ।

নিঃসন্দেহে এ সবই গান্ধী-রাজনীতির উত্তরাধিকার, কিন্তু খণ্ড উত্তরাধিকার মাত্র। গান্ধীপর্বে ব্যক্তিসর্বস্বতা ও ক্ষমতা-কেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল এই কারণে যে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী গান্ধী এই দুই বিপজ্জনক পদ্ধতির উগ্রতাকে আড়াল করে রেখেছিলেন তাঁর নৈতিক সুষমায় স্নিগ্ধ জীবনদর্শন দিয়ে। বস্তুত, গান্ধীবাদী মতাদর্শের বৈচিত্র্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-চর্যা জনচিত্তে এমনই প্রবল আলোড়ন তুলেছিল যে দেশ-বাসী গান্ধীর রাজনৈতিক কলাকৌশলের বিপদ তথা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ পান নি। এক কথায়, গান্ধী তাঁর মতাদর্শের মাধ্যমে কংগ্রেস রাজনীতির এক সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করেছিলেন, যে পরিপ্রেক্ষিতে যে-কোনো রাজনৈতিক পদ-ক্ষেপের জন্য গণ-অনুমোদন লাভ সহজ হয়েছিল। রাজ-নীতিবিদ হিসাবে গান্ধীর সাফল্য আর তাঁর উত্তর-সূরীদের ব্যর্থতাও এইখানে। গান্ধী-উত্তর যুগের কংগ্রেস নায়কেরা গান্ধীর জীবনদর্শনকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তাঁর প্রবর্তিত রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করে-ছেন। এর ফলে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে এইসব কৌশলের সংকীর্ণতা নগ্নভাবে প্রতিভাত হয়েছে জন-গণের সামনে। মতাদর্শ হিসাবে গান্ধীবাদের মূল্য স্বতন্ত্র বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু গান্ধীবাদকে পরিত্যাগ করে কঠোর রাজনৈতিক বিচারে যে বর্তমান কংগ্রেসের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এই সংখ্যায় যে চারজন কবির রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা সকলেই বাংলাদেশী। এই সংখ্যার গল্পলেখকও বাংলাদেশের।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

মাস দুয়েক হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে মালেক। শরীর ভালো হয়েছে। পিঠে, পায়ে, হাতে মিলিয়ে চার জায়গায় সেলাই করতে হয়েছে। ভুরুর ওপর বড়ো কাটা দাগ। মনে হয় অন্য মালেক। জেলে-পাড়ার কাদামাটির মতো চিত্রবিচিত্র দেহ এখন। ওর দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে যায়। মুখের ওপর একটা অত বড়ো দাগ ওকে অন্য-আদলের মানুষ করেছে। কত বদলে গেল মালেক। সাফিয়া তুমুল বৃষ্টিতে তোরাব আলীর গোরুর জন্যে ঘাস কাটতে-কাটতে বুঝতে পারে না কোন্‌টা ওর চোখের জল, কোন্‌টা মেঘের জল। গতকাল মালেক ফিরে জয়গুনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। জয়গুন বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করেছে। হাঁস জবাই দিয়ে ভাত খাওয়াতে চেয়েছিল, ও রাজি হয় নি। বলেছে আর-একদিন আসবে। সাফিয়া কেবল জিজ্ঞেস করেছিল, ক্যান আছ?

—ভালা।

মালেক এর বেশি জবাব দেয় নি। ওকে কিছু জিজ্ঞেসও করে নি। বেশিক্ষণ থাকে নি। কাজ আছে বলে চলে গেছে। মালেক কি ওর কথা এখন আর তেমন করে ভাবছে না? ওর নাকি এখন অনেক কাজ। সমিতি আবার গড়বে, সুজার সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। রাতদিন খাটনি না করলে এতগুলো পেট ভরানো মুশকিল। সাফিয়ার বুক ভেঙে আসে, কষ্ট দ্রুত বাড়ে। ও ঘাসের স্তূপের ওপর মাথা রেখে বসে থাকে। বৃষ্টিতে চারদিক ধোঁয়ার মতো হয়ে গেছে। ওর মনে হয় ও একটা বিশাল জালে আটকা পড়েছে। এখান থেকে আর কিছুতেই বেরুতে পারবে না। ওর সামনে কোনো দিগন্তরেখা নেই, আকাশের সীমানা অস্পষ্ট। সাফিয়া ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যায়।

সুজার তিন বছর জেল হয়েছে। তাহের আর রজবের বছর দুয়েক করে। মালেক সমিতি নিয়ে ব্যস্ত। আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেছে। বিজয়ী তোরাব আলীর অখণ্ড দাপট, সবাইকে ঠান্ডা করে ফেলেছে। এই বোধে আত্মতৃপ্ত এবং অহংকারী। ভেঙে-পড়া মানুষগুলোকে নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে মালেকের। সামনে প্রবল প্রতিপক্ষ তোরাব আলীর হুমকির শেষ নেই। তাতে ও ভয় পায় না। কেউ ওর ডাকে সাড়া দেয়, কেউ দেয় না।

ও ধৈর্য হারায় না। মার খেয়ে নিজের মধ্যে স্থিত হয়ে গেছে। অনবরত মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে, বিফল হলে মন খারাপ করে না। সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম, কষ্ট হয়, তবু চেষ্টার অন্ত নেই, দুঃসহ সময়কে অতিক্রম করতেই হবে। সুজার ছেলে-মেয়ে-গুলোর অসহায় দৃষ্টি ওর বুকে বিঁধে থাকে। তবু ভরসা, সুজা একদিন ফিরে আসবে, সংসারের হাল ধরবে। ও চোরাপথে চেষ্টা করেছিল, ব্যর্থ হয়েছে, এবারে সংগ্রামের পথে নামবে। মালেক বুকে আশা রাখে, সুজাদের চেতনা ফিরলে ওর কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। কাউকে বোঝাতে হবে না, যে যার অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হবে।

মালেক এখন লবণ-চাষে ব্যস্ত। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর সমুদ্রে যায় নি, হাঙর-ধরার মৌসুম আসছে। আর মাস দুয়েক বাকি। এবার আর তোরাব আলীর নৌকা নয়, সমিতি থেকে নৌকা জোগাড়ের চেষ্টা করছে। মালেক ওদের বলেছে, নৌকা জোগাড় হলে হাঙর বিক্রির সব টাকা ওরা সবাই ভাগ করে নেবে—একদম সমান ভাগ, কম-বেশি নয়। সকলে চাঁদা দিতে রাজি হয়েছে। চাঁদা তুলে ওরা দুটো নৌকা, বড়শি, জাল কিনবে। আশ্বিনের রোদে মাথা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। সামনের সপ্তাহে লবণ-তোলার কাজ শেষ হবে। বুক-পিঠ বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম নামছে। পায়ে রবারের জুতো গরম হয়ে উঠেছে। হাতা দিয়ে লবণ টানতে-টানতে বুকে হাঁফ ধরে যায়। ও গামছা দিয়ে মাথার ঘাম মুছে আলের ওপর বসে পুটলি খুলে চিড়া-গুড় বের করে। শুকনো চিড়া চিবুতে কষ্ট হয়, চোয়াল ব্যথা করে, তবু বেশ খানিকটা খেয়ে ঢকঢকিয়ে পানি খায়। এইসব কাজ ওর ভালো লাগে না, কেবলই সমুদ্রের স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে। তোরাব আলীর নৌকায় ও আর হাঙর ধরবে না। তাই এইসব কাজ করা। তবুও কি রক্ষা আছে? তোরাব আলীর কাজ না করলে কী হবে, গফুর মিয়ারটা করতে হচ্ছে। যতক্ষণ না নিজেরা কিছু করতে পারবে ততক্ষণ এভাবেই চলবে।

বিকেলে ভেড়িবাঁধের ওপর দিয়ে ঘরে ফিরতে সাফিয়ার কথা মনে হয়। শুকুর খুন হয়েছে বলে সাফিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না, তাও নয়। প্রচন্ড নিষ্পৃহতা ওকে এসব থেকে বিমুখ করেছে। ওর ভালো লাগে না। এইসব জটিলতা পাশে রেখেই এগুতে চায়, কিন্তু ক্লান্তি আসে কখনো। এই এখন যেমন নিঃসঙ্গতা ঘায়েল করছে। মন চায় পরিবর্তন—চায় ঘর, সন্তান। পরমুহূর্তে হেসে ওঠে। লাফিয়ে স্লুইস গেট পার হয়, দূরে জেলেপাড়ার ঘরবাড়ি, নারকেলসারি, মরিচের খেত, শুকুতে-দেওয়া জাল চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এইসব দৃশ্য বড়ো বেশি আপন, একান্ত নিজস্ব। এইসবের ভেতরেই ওর সুখদুঃখের বিস্তার, ভালোবাসার-বেদনার ঘরগেরস্থি। ছিন্নভিন্ন টুকরো-টুকরো হয়ে মালার মতো গেঁথে আছে, যেমন সেনট মার্টিনের কালো-পাথরের চাঁই। গামছার মাথায় কিছু লবণ বেঁধে এনেছে, এখনো বড়ো-বড়ো মোটা দানা। সুজার ঘরে দেবে, এসবই এখন ওদের প্রয়োজন। কাঞ্চন লবণের দানা মাটির খোলায় টেলে পাটায় পিষে গুঁড়ো করে নেবে। পটলা ঘরের চালের বাকি কাজ নিজেই সেরে নিয়েছে। ওদের পরিবারের সব সদস্য দুমুঠো ভাতের চিন্তায় রাতদিন ব্যস্ত থাকে। বড়ো ভালো লাগে ওদের পরিশ্রম। ওরা এখন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় রত। মালেক লবণের পুটলি কাঁধের ওপর ফেলে ওদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

রূপা দৌড়ে আসে।

—কাকু?

—ক্যান আছস তোরা?

—ভালা।

ও মাথা নাড়ে। বাপের জেল হবার পর ও বিষণ্ন, গম্ভীর হয়ে গেছে। কথা বলার আগে চোখ ছলছল করে।

—তোর মা কডে?

কাঞ্চন মাথার ঘোমটা টানতে-টানতে আসে। মালেক লবণের পুটলি রূপার হাতে দেয়।

—চাল আছে না ভাবি?

—পরশু তো দি গেলা, আছে।

—কিছু লাগিব না?

—না, অন না। তুই আর কত করিবা?

—ইবা কথা ছাড়ি দ।

দুজনে চুপ করে থাকে। কথা ফুরিয়ে যায়। কী বলবে খুঁজে পায় না।

—তোঁয়ার ভাই-র কত্তদিন হৈল?

—হিসাবে কাম কী? হিসাব করিলে দেখিবা দিন

ন ফুরায়। আর হিসাব ন করিলে দেখিবা একদিন বেয়ানে বড়ভাই আসি্য পড়িব।

কাঞ্চন চোখ মোছে।

—আঁই অন যাই। কিছু লাগিলে পটলারে দি খবর দিও।

—তুঁই হাঙর মারিত ন যাইবা?

—যাইয়ম।

—নৌকা জোগাড় হইয়ে না?

—হ, আর কিছু টেঁয়া হইলেই হয়। হই যাইব। চিন্তা ন কর।

—পটলারে তোঁয়ার লগে নিও?

—নিয়্যস। অন তো কাম শিখন লাগিব।

রূপা কাছে এসে দাঁড়ায়। কাকু, আঁই দাদীর কাছে যাইয়্যম।

—আয়।

রূপা মালেকের পিছু-পিছু আসে। ওর মনে হয় ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠেছে, সুজা বাইরে থাকতে এত টান অনুভব করে নি। দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে কি এমন হচ্ছে, না-কি এ এক অন্যরকম ভালোবাসা? মালেকের বুকের দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় এক অন্যরকম ভালোলাগা। এই ভালোলাগা দিয়েই জীবনের বিস্তার ঘটে। হঠাৎ ওর মনে হয়, রূপা বড়ো হয়েছে, ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে আবার যদি জুলেখার পরিণতি দেখতে হয়? না—ও অস্ফুট স্বরে বলে।

—কাকু, কী হৈল?

—কিছু না।

ততক্ষণে ওরা ঘরের কাছে পেঁৗছে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তির পর মাথা এখন ঝরঝরে। মনে-মনে রূপার জন্যে একটা যোগ্য ছেলে খোঁজে। কার হাতে ওকে তুলে দেওয়া যায়? ভিড় করে কতগুলো মুখ ভেসে ওঠে। কাকে ও পছন্দ করবে? রূপাকে ঘরে পেঁৗছে দিয়ে নাফের ধারে আসে। সাফিয়ার বাড়ির কাছাকাছি ওর একটা প্রিয় জায়গা আছে। রূপা কি সাফিয়ার মতো হবে? ভালোবাসার বৈষয়িক দিকের মূল্য ওর কাছে প্রাধান্য পাবে? কী যে আবোল-তাবোল ভাবনা! রূপা এখনো শরীর চেনে নি, পুরুষের ঘ্রাণ পায় নি, ওকে কি এখন বিচার করা চলে? রূপা লক্ষ্মী মেয়ে হবে—বারবার একটি বাক্য নিজের মনে আওড়াতে থাকে। এই বাক্যটি ওকে স্বস্তি দেয়। বাক্যটি বলার সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে যেন একটি কাঁটা উঠে আসে। নির্ভার মনে হয় নিজেকে। সঙ্গে-সঙ্গে পিতৃত্বের বোধে আক্রান্ত হয়। যেভাবেই হোক সুজা বেরুনোর আগেই রূপার বিয়ে দিয়ে দেবে। তারপর কি শুরু হবে পোড়-খাওয়া জীবন, কষ্টকর, ক্লান্তিকর, বেদনাদায়ক? এজন্যেই শাহপরি দ্বীপের মানুষের মঙ্গল চাই। সারাদিনের কাজের পর জ্যোৎস্না-রাতে পুঁথি-পাঠের আসর, নয়তো ঢোল বাজিয়ে গান, নয়তো যাত্রা। কাজের শেষে আনন্দ, আনন্দের মধ্য দিয়ে নতুন শক্তি অর্জন, তারপর আবার কাজ। এভাবেই জীবনের চক্রাকার ঘূর্ণাবর্ত। এ জীবনের রূপারা হাসি-খুশি, মায়াময়। জ্যোৎস্না-রাতে নাফের পাড়ে পরী হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

ও জিয়োলগাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে, নাফের বুকে সন্ধ্যা নামে। কদিনের মধ্যে ওদের নৌকা কেনা হয়ে যাবে, বড়শি হবে, তারপর একদিন হাঙর ধরার যাত্রা। ফিরে এসে সমান হিস্যা ভাগ করে নেওয়া। এ পর্যন্ত শাহপরি দ্বীপে এ ধরনের কোনো কিছু কেউ করতে পারে নি। সবাই নিয়মের আবর্তে ঘুরেছে, উদ্যোগ নেয় নি। ও একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে। প্রশান্তিতে চোখ বুঁজে এলে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। ঘরে ভ্যাপসা গরম, এখানে স্নিগ্ধ বাতাস। বারবার তন্দ্রা ছুটে যায়। সাফিয়ার এখন ঘোর বৈধব্য। অথচ শুকুরের ব্যাপারে ও আশ্চর্য নির্লিপ্ত। লাশটা পর্যন্ত দেখতে যায় নি। ওকে দেখে মনে হয় না যে কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়েছে। মালেক কিছুই বুঝতে পারে না। কেবলই মনে হয় সাফিয়ার সঙ্গে ওর অনেক ফাঁক, কিছুতেই পূরণ হয় না। রাত নামলে ঘরে ফিরতে চায়। পথে সাফিয়ার ঘর। জয়গুন শুকনো পাতার বোঝা নিয়ে ফিরছিল। ওকে দেখে ডাকে।

—এককানা বই য, বাবা!

ও সম্মতি জানায়। দুজনে ঝাঁপ খুলে উঠোনে ঢোকে। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে সাফিয়া, পিঠের ওপর চুল খোলা, ধূলিধূসরিত পা, ক্লান্ত বিধ্বস্ত চাউনি, কিছুক্ষণ আগে ঘাস কেটে ফিরেছে। ওদের দিকে একপলক তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

—তুঁই ব বাজান, আঁই আসি্য।

জয়গুন ঘর থেকে হাঁসের ডিম নিয়ে ভাজতে যায়।

—ও সাফিয়া, হাতমুখ ন ধুবি? য্যান করি বই হইয়্য মনত হয় তোর মা মরি গিয়ে।

জয়গুনের কণ্ঠ কিছুটা ঝাঁঝালো। সাফিয়া কোনো উত্তর না দিয়ে কুয়োতলায় যায়। মালেক বসে থাকে, নিজের ওপর বিরক্ত হয়। এখানে না এলেই পারত। খামোকা ঢুকেছে, গলার কাছে তেতো স্বাদ। একটু পর জয়গুন ভাজা ডিম নিয়ে আসে, সঙ্গে একবাটি চিড়া। ওর মনে হয় আসলে ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে।

—খ, বাজান।

ও সঙ্গে-সঙ্গে খেতে শুরু করে। ততক্ষণে সাফিয়া এসে গেছে। মুখ জুড়ে পানি, কানের কাছে ঝুলে থাকা চুল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। মালেকের দৃষ্টি আটকে যায়, ঠিক মুক্তোর মতো মনে হয় পানির ফোঁটা। সাফিয়া আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। হাতে পেঁচিয়ে খোঁপা বাঁধে। আবার অন্যরকম দৃশ্য। পানি নেই, শুকনো মুখ, মুহূর্তে বদলে যায় দৃশ্য—যেমন বদলে যায় সাফিয়ার জীবনযাপন। এবার মালেক ঝিনুক ওঠায় নি, সেজন্যে সাফিয়াকে কষ্ট করে ঘাস কাটতে হচ্ছে, সেই তিক্ততায় মন রুষ্ট। ডিম চিড়া পেট পুরে খেয়ে ওর একটা বেশ মানসিক তৃপ্তি আসে। সাফিয়া বাঁকা করে তাকায়।

—এই মৌসুমত ঝিনুক ন উডাইলা?

—তন তো হাসপাতালে থাইলাম।

জয়গুন পেতলের গ্লাসে পানি এনে দেয়।

—অ চাচী, ঝিনুক ন উডাই দেই সাফিয়া আঁরে খোঁটা দেয়।

—হিতার আবার অগ্যা কথা। তুঁই যে পরানে বাঁচি গিয় ইবাই তো বেশি, বাজান?

—হ, তুঁই তো কইবাই। কতগুলান টেঁয়া—

সাফিয়া ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে। জয়গুন বিব্রত, হতভম্ব। মালেকের মুখে কথা নেই। ও সাফিয়ার অভিমান বুঝতে পারে না। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মালেক ওকে কাছে ডেকে কথা বলে নি, ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে নি, এই বেদনায় ও মর্মাহত।

—চাচী, অন আঁই যাই?

—যাইবা?

জয়গুন ইতস্তত করে। সাফিয়ার কান্নায় মালেক বিরক্ত বোধ করে, এখন এইসব ভাবাবেগ ওকে তেমন অভিভূত করে না। কান্নার ধ্বনি থেমে আসছে। বুক-ভাঙা, হৃদয়-নিংড়ানো শব্দ যেন। জয়গুন ঘরে যায়। মালেক উঠোন পেরিয়ে চলে আসে, একবারও পেছনে তাকায় না। ওর সামনে এখন অনেক কাজ।

শেষ পর্যন্ত নৌকা এবং বড়শি হয়ে যায়। মৌসুম শুরু হয়ে গেছে, আর দেরি করা চলবে না। মালেক দুই ডোলা কুইচ্চা তুলেছে, যাত্রার আয়োজন শেষ। সমবায়ের নৌকা বলে ঘাটে লোক থইথই। ওর প্রথম পদক্ষেপ সফল হয়েছে। সেই আনন্দে, গর্বে ও উত্তেজিত। সমবায়ের একটা নৌকা হয়েছে, বড়শি হয়েছে, আস্তে-আস্তে নৌকা, বড়শি, জাল বাড়বে। ও সবার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলে—দেইবা অ্যান ডর অগ্যা হাঙর ধইরগ্যম যা শাহপরি দ্বীপের কেউ কোনোদিন ন ধরিত পারে।

—ঠিক কইয়ন, মালেক ভাই। তরুণ ছেলেরা উৎসাহে হাততালি দেয়। এইবার তুঁই মারো, তারপর আঁরা মাইরগ্যম। তোরাব আলীর নাকর সামনে ঝুলাই রাইখ্যম।

হো-হো হাসিতে ভেঙে পড়ে ওরা। হাসি-আনন্দে নৌকা ভাসে ওদের। ওর সঙ্গে আছে বাদল আর করম। বদরমোকাম ছাড়ানোর পর সূর্য এখন আড়াআড়িভাবে মাথার ওপর। করম নৌকা বাইছে। মালেক কুইচ্চা টুকরো করে দিচ্ছে, বাদল ঝটপট বড়শিতে গেঁথে ফেলে। এসব করতে দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেলে বড়শি নামায় সাগরে। তিনজনে উত্তেজিত, অনাগত ভবিষ্যতের সাফল্যের স্বপ্নে বিহ্বল। বৈঠায় করমের হাত থেমে আছে। নোঙরের দড়ি বাদলের হাতে। বড়শির চেন ধরে মালেক অনড়, স্থির। বিকেল গড়ায়, সন্ধ্যা নামে। বড়শিতে টান পড়ে না। মালেক চুপচাপ বসে থাকে। অন্ধকারে সমুদ্র যেন আরো বড়ো হয়ে যায়। দিনের বেলা তবু দিগন্তরেখা থাকে, অন্ধকারে সে রেখা মুছে গিয়ে সে বিশালত্ব মাপজোকহীন হয়ে পড়ে। মালেক মনে-মনে দমে যায়, মুখে কিছু বলে না, বরং বাদল মন খারাপ করলে ওদের সান্ত্বনা দেয়। রাত বাড়ে, জোয়ারে নৌকা দোলে। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়েছে, মিটমিটে

আলো এত বড়ো অন্ধকারে জোনাকির মতো জ্বলে। সকালের রাঁধা ভাত এনেছে হাঁড়িতে, পানি দিয়ে রেখেছে, তিনজনে মিলে তাই খেয়ে শুয়ে পড়ে।

পরদিন সারা দিন যায়, একটা ছোটো হাঙরও ধরা পড়ে না। আশেপাশের ট্রলার থেকে লোকজন চিৎকার করে খবর জানতে চায়, ওদের মুখ চুন। উত্তর দেবার মতো কিছু নেই। করম ভীষণ ভেঙে পড়েছে। জায়গা দেখে-দেখে নোঙর ফেলছে, বড়শি নামছে। কাজ হচ্ছে না, সব যেন একসঙ্গে উবে গেছে। মালেকের গলা দিয়ে ভাত নামে না, ওদের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ, ডাকলে চোখ তুলে চায়, সাড়া দেয় না তেমন। বাদল একদিন কেঁদে ফেলে।

—তুই কথা ন কও ক্যা, মালেক ভাই?

—চুপ থাক হালা। কথা কবি তো দিয়ম ফালাই।

চোখ লাল, অসহিষ্ণু চেহারা। বাদল আর কথা বাড়ায় না।

পাঁচ দিনের দিন বড়শি ফেলে ওত পেতে থাকে মালেক। বুক ছলকে ওঠে। বড়ো রকমের টান মনে হচ্ছে, ভার ঠেকছে। কনুই দিয়ে বাদলকে গুঁতো দেয়।

—বাদইল্যা, অন্যরকম লাগ্যে। পানিডাও ক্যান থমধরা দ্যাখ!

বাদল মালেকের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

—টান কি বেশি?

—হ।

—ডর মনত হয়, না?

—হ।

মালেক গভীর মনোযোগে নিরিখ করে। কুলকিনার-হীন অথই সমুদ্র যেন ওর বুকের ভেতর গর্জে ওঠে। আহ্, সেই স্বপ্নটা যদি সফল হয়? যদি সবচেয়ে বড়োটা ধরা পড়ে? উত্তেজনায় ওর বুক এখন ধুপ্‌পুর-ধুপ্‌পুর। আস্তে-আস্তে বড়শি আয়ত্তে রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। কখনো শক্ত হাতে ধরে, কখনো ছেড়ে দিয়ে আধবেলা খেলিয়ে মালেক ক্লান্ত হয়ে গেছে, আঙুলে কালসিটে দাগ পড়েছে, সঙ্গে টনটনে ব্যথা। শেকল এখন বাদল ধরে রেখেছে।

খবর রটে যায় চারদিকে। বড়ো একটা হাঙর গেঁথেছে মালেকের বড়শিতে, অনেক বড়ো, রঙ একদম ছাই হয়ে গেছে। মুখে-মুখে যারা এই-নৌকা ওই-নৌকায় খবর দেয় তারা একটু বাড়িয়ে বলে, গল্পের মতো পল্লবিত হয়ে খবর পৌঁছে যায় শাহপরি দ্বীপে।

মালেকের পেশিতে এখন অসুরের শক্তি। হাঙরের মুখের ভেতর গেঁথে-যাওয়া বড়শির আশেপাশে রক্ত ভাসছে। পানির ওপরভাগ লাল হয়ে আছে। কিছুটা ক্লান্ত হয়ে গেলে মালেক ওটাকে পানির ওপর টেনে আনবার চেষ্টা করে। লেজ ঝাপটে ওটা আবার ডুস করে ডুব দেয়। তখন ও শেকল ছেড়ে দেয়। অনেকটা নীচে চলে যায় জীবটা।

—বাদইল্যা! করম!

—ক্যান লাগে?

—কী?

—মহা ফুর্তি, মালেক ভাই। অ্যাতো ডর আর কেউ ধরত ন পারে। যেরকম খেলাইয়ে, মনত হয় অনেক ডর।

—অগ্যা ন, দুয়া রে, করম।

—দুয়া? বাদল চিৎকার করে ওঠে।

—হ রে, জোড়ায় আইস্যে, বাঁধা পড়ি গিয়ে।

—মাগো, অ্যাতো খুশি লই এই মৌসুমত ন বাইচ্যাম।

—ইবার লাগি তো মুখ ন খুলি।

—এই খবর হুনিলে তোরাব আলী ফিট পড়িবো। দেইয়ো আঁয়ার সমবায়ের নৌকা চুরি করির ভাঙি ফালাইব।

—থো তোর তোরাব আলী।

মালেক ওকে ধমক দেয়।

বাদলের উৎসাহে ভাটা পড়ে না। ক্যানে বুঝিলা দুয়া, মালেক ভাই?

—শিকল ধরির বুঝি। টানডা ট্যার ন পাস?

—পাই তো, কিন্তু তোঁয়ার নান বুঝিবার ন পারি।

মালেক খুশিতে ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। সেই বেলা থাকতে শুরু হয়েছিল, এখন বিকেল। নৌকায় ওঠাতে পারার কোনো লক্ষণই ও টের পাচ্ছে না। কেবল শিকল টানা আর ছাড়া বাদে কিছুই করার নেই। জীবটাকে সময় দিতে হবে, যতক্ষণ না ওটার শক্তি ফুরিয়ে আসে।

এর মধ্যে জেলেপাড়ার অনেক ছেলে বিভিন্ন জনের ট্রলারে করে চলে এসেছে, ওরা চারদিকে ভিড় করে, খবর জানতে চায়, মালেক চিৎকার করে ওদের চলে যেতে বলে। সবার ভেতরে উত্তেজনা। সমবায়ের নৌকায় প্রথম সাফল্য, নির্ঘাত ওদের সুদিন আসছে।

রাত যায়, পরদিন যায়, তার পরদিনও। পাঁচ দিনের মাথায় হাঙর দুটো কাবু হয়। মালেক আস্তে-আস্তে শিকল টানে। কোনো বাধা নেই, ও দুটো ক্রমাগত এগিয়ে আসছে।

—মরি গ্যাল নাকি?

—না, ন মরে। ত্যাজ ফুরাইয়ে।

আদিগন্ত নীল সমুদ্রের বুকে মালেকের স্বপ্ন আজ সত্যি হতে যাচ্ছে। শাহপরি দ্বীপের ছেলে-বুড়ো নারী-পুরুষ ভেঙে পড়বে হাঙর দেখতে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাবে ওর দিকে। ছুটে আসবে সাফিয়া, প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। মালেকের জয়জয়কারে মুখরিত হয়ে উঠবে ডাঙা। খবর চলে যাবে টেকনাফ। তারপর আরো দূরে, আরো—

নৌকার কাছাকাছি চলে এসেছে হাঙর। পাখনা ভাসছে, শরীর উঠে আসছে, দেখা যাচ্ছে পুরো অবয়ব। উত্তেজনা ধরে রাখতে পারে না ওরা, আনন্দের চিৎকার বেরোয় অনবরত।

—দ্যাখন মালেক ভাই, একদম নিথর।

—খেলাইয়ে তো কম ন। গায়ে আর বল নাই।

মালেক তৈরি হয়, প্রথম হাঙরটা ও একাই টেনে তুলবে। কাউকে ধরতে দেবে না। বাদলকে সরে যেতে বলে। প্রায় দেড়মন ওজনের হাঙরটা টেনে তুলতে ভীষণ কষ্ট হয় ওর। নৌকার ওপর ধপাস করে ফেলতেই লেজে বাড়ি মেরে নড়ে ওঠে হাঙরটা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটা মরণকামড় দেয়। সতর্ক হবার সময় ছিল না মালেকের। ডান হাত চলে যায় হাঙরের মুখে। বাদল আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে।

—মালেক ভাই গো!

—চুপ হারামজাদা, পানিরডা টানি উডা।

ওর ধমকে থতমত খেয়ে বাদল বিমূঢ় হয়ে দ্বিতীয় হাঙরটা টেনে তোলার চেষ্টা করে। মালেক বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কাঁধের কাছের ক্ষত চেপে ধরে। শরীর থেকে হাত একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। চামড়ার সঙ্গে ঝুলছে, যেন একটু টান পড়লেই আলগা হয়ে যাবে। রক্তের রেখা গড়ায় পাটাতনে। অচেতন হবার মুহূর্তে ও দেখতে পায়—বাদল তখনো দ্বিতীয়টা টেনে তুলতে পারে নি, ধস্তাধস্তি করছে। ও শুনতে পায় এগিয়ে আসা ট্রলারের শব্দ, ওর মাথায় স্বপ্নের বুড়বুড়ি, মনে হয় ও একটা বিশাল পরিবারের প্রধান পুরুষ, হাজারো দায়িত্বে নিয়োজিত, অথচ কিছুই গুছিয়ে করা হয় নি। সজ্ঞানে শেষবারের মতো বুড়বুড়ি হয়ে ভেসে ওঠে শাহপরি দ্বীপ। এই দ্বীপের কেউ যেটা পারে নি ও তা পেরেছে। ওর শক্তি ফুরোয় নি। ও ওর হাজার-মানুষ-সম্বলিত পরিবারে বাকি কাজগুলো শেষ করতে পারবে। সবকিছু অন্ধকার হতে থাকে। মিলিয়ে যায় শক্তি, ফুরিয়ে আসে চেতনা। বুজে যায় চোখ। মগজের আলোকিত রেখার মাথায় বিন্দুর মতো এগিয়ে আসে একজন পরাজিত মানুষের ছায়া। ও প্রাণপণে সেই ছায়া তাড়াতে চায়। আদিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের বুকে হাজার-হাজার বুড়বুড়ি ওঠে আর মিলিয়ে যায়। ওর আর কিছু মনে থাকে না।

সমাপ্ত

জানুয়ারি ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত শীর্ষেন্দু চক্রবর্তীর কবিতাটির নাম 'ফেরার হয়েছি'। ছাপার ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

চ্যালেনজ অব এডুকেশন—

শিক্ষানীতির একটি প্রেক্ষিত

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১

১৯৮৫-র অগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক উপরোক্ত নামে যে শিক্ষা-বিষয়ক খসড়া দলিলটি প্রকাশ করেন, তা নিয়ে সারা ভারতে আলোচনা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে শিক্ষকসংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সংস্থা সেমিনার, বিতর্কসভা, কর্মশালা প্রভৃতির আয়োজন করেছে।

দলিলটি প্রসঙ্গে দুটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো। দলিলটি একটি খসড়া (ড্রাফট)। কোনো পূর্ণাঙ্গ, চূড়ান্ত শিক্ষানীতির প্রতিবেদন নয়। দলিলটি প্রকাশিত হয়েছে "জাতীয় বিতর্ক" প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে। শিক্ষার সমস্যা এতই মৌলিক এবং জটিল যে, নানাদিক থেকে শিক্ষাবিচারের অপেক্ষা আছে, এবং শিক্ষার ব্যাপারে কেউ-ই সবজান্তা নয়। নানা কমিশন আর কমিটির প্রতিবেদন থেকে আমাদের দেশের শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য অনেকেরই জানা। বর্তমান দলিলে তাই "নতুন শিক্ষানীতি"-র ঘোষণা নেই, আছে নতুন কালের প্রয়োজনানুরূপ সম্ভাব্য শিক্ষানীতির "একটি প্রেক্ষিত" (এ পারসপেকটিভ)।

দলিলটি নিয়ে এত যে হৈ-চৈ, এত উত্তেজনা, উৎসাহ এবং আশঙ্কা, সারস্বতভবনের সেবাইত থেকে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, রাজনীতি-ব্যবসায়ী, নানা দলের পালোয়ানদের এত যে উৎকণ্ঠা, তাতে বোঝা যায় দলিলটিতে অনেক সত্য কথা আছে।

সত্য কথা আছে বলেই বোধ হয়, কোনো-কোনো মহলে দলিলটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি (W.B.C.U.T.A.) বিতর্কচলাকালেই গত ১২ই ডিসেম্বর একদিনের কর্মবিরতিও পালন করেছে।

দলিলটি ছোটো, এবং চারটি অধ্যায় আর ৩০৭টি উপধারায় (সেকশনস) বিভক্ত। মোটামুটি ৪০টি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের শিক্ষাসমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে যেমন স্যাডলার কমিশন থেকে আরম্ভ করে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট অবশ্যপাঠ্য; ব্যাপকতায়, সামগ্রিকতায়, প্রসন্নগাম্ভীর্যে এইসব রিপোর্ট যেমন উপাদেয়, বর্তমান দলিলটি তা নয়। মনে হয়, আমলাতন্ত্র তাড়াহুড়ায়, খানিকটা অগোছালোভাবে, দলিলটি তৈরি করেছেন। নৈয়ায়িক যুক্তিপরম্পরার অভাব এবং রচনাশৈলীর প্রসন্নতার অভাব দলিলটিতে সহজেই চোখে পড়ে।

২

১৯৬২-৬৪ সালের কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৮ সালে একটি "জাতীয় শিক্ষানীতি" ঘোষিত হয়েছিল। সেই শিক্ষানীতি কি ব্যর্থ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তবে সেই ব্যর্থতার কারণানুসন্ধান করে প্রতিকারের পথ নিলেই তো সঠিক কাজ হত। ১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতি যখন বাতিল হয় নি, তখন ১৯৮৫ সালে পুনরায় নতুন শিক্ষানীতির একটি প্রেক্ষিতের প্রয়োজন হল কেন? প্রশ্নটি সংগত এবং দলিলটির বিভিন্ন অংশে এরই উত্তর আছে। এই উত্তরই নতুন শিক্ষানীতির "প্রেক্ষিত"।

১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতিতে ঘোষিত হয়েছিল এইসব লক্ষ্যের কথা :

(ক) শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, (খ) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, (গ) শিক্ষাকে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত করা, (ঘ) শিক্ষার সুযোগের পরিকল্পিত ক্রমপ্রসার, (ঙ) শিক্ষার গুণোৎকর্ষ ও মানবৃদ্ধিকল্পে নিরলস উদ্যোগ, (চ) বিজ্ঞান ও টেকনোলজি বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ, (ছ) সামাজিক ও নৈতিক মূল্যের চর্চা প্রভৃতি।

বর্তমান দলিলে এইসব স্বীকৃত আদর্শ প্রত্যাখাত হয় নি; অপরপক্ষে, আত্ম-সমালোচনা করে বলা আছে :

"এইসব আদর্শ হতে আমরা অনেক পশ্চাতে পড়ে আছি।" কারণ কী, সে আলোচনাও দলিলটিতে আছে।

৩

বর্তমান দলিলের সার্থকতাটা তাহলে কোথায়? ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার হেরফের নিয়ে তো কম আলোচনা হয় নি; কী আমাদের করণীয়, তাও তো শিক্ষাশাস্ত্রীরা বলে গেছেন এক যুগে। দলিলটি যে নতুন বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল এই—১৯৬৮ থেকে ১৯৮৫—এই সতেরো বছরে পৃথিবী দ্রুত বদলে গেছে,—আগামী দিনের পৃথিবী ভারতের দরজায় এসে গেছে। ২১ শতকের এই পৃথিবী হবে একদিকে বার্তাসমৃদ্ধ (ইনফরমেশন-রিচ), অন্যদিকে কৃৎকৌশল-নিবিড় (টেকনোলজি-ইনটেনসিভ)। এই পৃথিবীর চরিত্র সম্পূর্ণ নতুন এবং এর দাবি আলাদা। স্বভাবতই, ওই যুগে শিক্ষার ও বিদ্যার্জনের নিত্যনতুন প্রয়োজন দেখা দেবে, এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য নতুন-নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। শেখবার ক্ষমতার চাইতে 'কী শেখা হল', সময়-সীমায় নির্দিষ্ট, প্রথাসিদ্ধ স্কুল-কলেজি শিক্ষাই শুধু নয়, জীবনভোর ও অবিরাম শিক্ষা-প্রক্রিয়া কতটা বজায় রইল, ওই যুগের সেটাই সমস্যা।

"The world of tomorrow which would usher in an information-rich and technology-intensive society calls for new approaches to learning. Life-long and recurrent education would be the order of the day".

৪

আগামী দিনের পৃথিবীটা ('দি ওয়ার্ল্ড অব টুমরো') কেমন? এর মূল্যায়নেই দলিলটির অভিনবত্ব। দলিলটির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য এইখানে যে, এর প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে : শিল্পবিপ্লব (সাবেকি পদ্ধতিতে) সম্পন্ন করে ভারতবর্ষ এখনও আধুনিক, শিল্পায়িত সমাজ গড়ে, উন্নত দেশের সারিতে এসে দাঁড়ায় নি, সত্য। এদেশ এখনও সম্পন্ন নয়, এখনও কৃষিপ্রধান এবং এদেশের সমাজ এখনও মূলত ঐতিহ্যানুসারী। কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে, বিশেষত ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৫—এই সতেরো বছরে,—ভারতে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলের 'বিপ্লব' ঘটে গেছে যার তাৎপর্য ও সুদূরপ্রসারী। এইসব পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে আমাদের কেতাবি বাবুদের অজানতে। এই পরিবর্তন প্রথাসিদ্ধ বিদ্যায়তনের প্রভাববহির্ভূত। একদিক থেকে বলা যায়, কেতাবি জগতের পণ্ডিতদের দ্বারা নন্দিত। ঐতিহাসিকভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও এদেশের সংস্কৃতিতে, বিশ্বাসে, সংস্কারে, লাডাইটদেরই জয়জয়কার—সেই যন্ত্রভাঙানিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রমজীবীদের মধ্যেও আছে, বুদ্ধিজীবীদের

মধ্যেও আছে। এই যে যন্ত্র-অনামনস্কতা, যন্ত্রবিরোধিতা এবং যন্ত্র-অবজ্ঞা, তার সঙ্গেই মিলেমিশে আছে আমাদের তাৎকালিক রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও। ভারতবর্ষে শিল্পায়ন চলছিল কিন্তু ১৯৬৮-র পর থেকে এদেশে সূত্রপাত হল 'বিজ্ঞান বিপ্লব'। যেদিন ভারতবর্ষ পরমাণুশক্তিতত্ত্ব আয়ত্ত করে শিল্পের কাজে পরমাণুকে ব্যবহার করবার কৌশল শিখল, সেদিন থেকেই যুগান্তরের সূচনা। গত সতেরো বছরে যে যুগান্তর এসেছে এদেশে, তার অসংখ্য প্রমাদের মধ্যে কয়েকটি এই : (ক) দেশ পরমাণুশক্তিবিজ্ঞান এবং পরমাণুবিভাজনের কৃৎকৌশল আয়ত্ত করেছে ; (খ) ইলেকট্রনিকসবিজ্ঞান এবং আনুষঙ্গিক কৃৎকৌশলও ; (গ) রেডিও, ট্র্যানজিসটার তো আছেই, কিন্তু অধুনা দূরদর্শনের যুগে প্রবেশ করেছে ; (ঘ) মহাকাশবিজ্ঞান আয়ত্ত করে, উপগ্রহ-বার্তা-বিনিময়ের কৌশল শিখেছে ; (ঙ) এখন ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে যন্ত্রগণক (কমপিউটর), যন্ত্রমানব (রোবোট) এবং স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতার যুগে (কমপিউটার, রোবোটিকস, অটোমেশন)।

দলিলটির মূল জিজ্ঞাসা—আমরা এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মুখোমুখি হব কিনা ? অথবা, আমরা অতীতচারী হয়ে চিরায়তের তথা সনাতনের মরুবালুরাশিতে মুখ লুকিয়ে এই বিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব ? প্রশ্ন হচ্ছে—আজ কেমন করে আমরা ভবিষ্যতের মুখোমুখি হব—যে ভবিষ্যতে নিহিত আমাদের বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি। দলিলে যে "প্রেক্ষিত" তুলে ধরা হয়েছে তা যে খুব মৌলিক, তা নয়। ধারণাগুলি (প্রেক্ষিতে যা আছে) আজ সব দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এগুলি যে সবই সঠিক, তা নাও হতে পারে। আরও সুন্দর ভাষায়, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক পটভূমিতে, অনাড়ম্বর, ধারণাগুলিকে হয়তো সাজানো যেত। কিন্তু দলিলটি নানা মহলে যে আবেগ-রাঙা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তাতেই বোঝা যায় যে দলিলটির প্রতিবেদনে এমন সব কথা তোলা হয়েছে যার প্রাসঙ্গিকতা আছে এবং যার তাৎপর্য সুগভীর। এবং এসব কথা আমাদের চিরায়ত, লোকোত্তর (ট্রানসেনডেনটাল) মানসিকতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

৫

প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর স্তরে বিন্যস্ত হলেও শিক্ষাব্যবস্থা একটি "সমগ্র ব্যবস্থা" কেননা এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের রয়েছে নিবিড়, অঙ্গাঙ্গী যোগ। কিন্তু নানা কারণে আজও এদেশের শিক্ষাকাঠামো উলটে-যাওয়া পিরামিডের মতো। ১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতির ব্যর্থতা থেকে আজ একথা বোঝা গেছে যে, সমাজ-উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে এবং দেশের মানসিকতা, সংস্কার, প্রথা আর বিশ্বাসের সঙ্গে, তদুপরি তাৎকালিক মূল্যবোধের সঙ্গে, শিক্ষা এতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, কোনো ঐন্দ্রজালিক তার জাদুদণ্ডস্পর্শে এর আত্যন্তিক সুরাহা করে দিতে সক্ষম হবেন না। স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষার "পরিমাণগত" বিকাশ ঘটেছে, অসংখ্য স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোটি-কোটি ছাত্র স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাচ্ছে। কিন্তু মাঝপথে অনেকে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়, এবং সব স্তরেই ফেলের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক, প্রথাবদ্ধ শিক্ষার জগৎ থেকে অনেকে নির্বাসিত হয়। যারা পাশ করে বের হয়, তাদের মধ্যে অধিকাংশই পুঁথিগত, কেতাবি বিদ্যা মুখস্থ করে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং দেখা যায় যে, কি ভাষাগত, কি গাণিতিক, কি কায়িক, কি হাতে-কলমে কাজ করবার দক্ষতা—সবই তাদের অনায়ত্ত। পরাধীন ভারতে তবুও স্বল্প বেতনে নিয়োজিত, শিক্ষায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষকের অভাব ছিল না। অথচ স্বাধীন ভারতে, দরিদ্র দেশের পক্ষে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পারিশ্রমিকের বিনিময়েও আদর্শ শিক্ষকের আজ বড়ো অভাব। কিভাবে শিক্ষকদের মধ্যে চেতনা এবং প্রেরণা জাগ্রত করা যায়, সেটাও আধুনিক ভারতের একটা বড়ো সমস্যা। ফরমাল শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার, প্রথাসিদ্ধ স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ, শিক্ষকসমাজের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি করেও দেখা গেছে শিক্ষার রাজ্যের হেরফের তো ঘোচেই নি, বরং নানা খাতে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা কি কিছু নেই ? নিরুদ্দেশ অসার্থক শিক্ষাকেই কি আজও 'শিক্ষা' বলে চালাব ?

৬

দলিলে আছে, সমস্যা অনেক—তার লম্বা ফিরিস্তি দেওয়াও কঠিন নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য যদি আমরা এখন থেকেই প্রস্তুত না হই, তবে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। ছুতো-নাতা খুঁজে, অ্যালিবাই দিয়ে ভবিষ্যতের কাছে জবাবদিহি এড়ানো যাবে না।

আমাদের সামনে সমস্যা অনেক। এক : প্রাথমিক শিক্ষাকে 'সর্বজনীন' করে তোলা। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যেমন হয়েছে, জনবিস্ফোরণের ফলে তেমনি অপড়ুয়ার সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে ৬ কোটি অপড়ুয়া শিশুর কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়াটাই এখন প্রধান "জাতীয় কর্তব্য"। দুই : মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে অপ্রাসঙ্গিক, কেতাবি, পরীক্ষা-ও পাশ-সর্বস্ব। জীবনের সঙ্গে, কাজ এবং শ্রমের সঙ্গে অসংপৃক্ত। তিন : উচ্চতর শিক্ষা তো বনিয়াদের তুলনায় মাথাভারি, এবং জাতীয় বিকাশধারার প্রয়োজনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ, অপ্রাসঙ্গিক, এবং সাধারণভাবে নিম্নমানের। এ ছাড়া অঞ্চলে-অঞ্চলে, নারী-পুরুষে, উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণে, একদিকে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি শিক্ষার মধ্যে অসমতা আর বৈষম্য এখনও বিদ্যমান।

এসব কথার আরও বিস্তার করা চলে। চালু শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা "সর্বজনীন" হয় নি, নিরক্ষরতার দূরীকরণ হয় নি, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি, বিদ্যায়তনগুলি (অধিকাংশ) কোনোমতেই "আদর্শ" নয়। তা ছাড়া, বিদ্যালয় থেকে কৃতকার্য হয়ে যারা বের হয় তারা না শেখে হাতের কাজ না তারা শরীরশ্রমে পটু, হস্তশিল্পে, কিংবা শ্রমশিল্পে, কিংবা যন্ত্রপাতি মেরামতিতে তারা প্রায়শই অজ্ঞ। অর্থাৎ জীবনের মৌলিক বিষয়ের 'জ্ঞান' ওই ব্যবস্থায় সম্ভব হয় নি। জীবনের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান, খাদ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, রন্ধনবিদ্যা, হাতের কাজ, সাইকেল-সারাই, ইলেকট্রিক ফিউজ লাগানো, পাম্প সারাই, উদ্যানবিজ্ঞান প্রভৃতি স্কুল-কলেজি শিক্ষায় সবই অনাদৃত। ভাষাশিক্ষা নিয়ে মনকষাকষি, মতানৈক্য, আবেগচালিত অবস্থানের ফলে উত্তম ভাষাজ্ঞানও (মাতৃভাষায়ও) কালেভদ্রে হয়। এবং তথাকথিত অনেক শিক্ষিতেরই যুক্তিবিচার করবার ক্ষমতাও নেই এবং নিজের মনোভাব প্রকাশ করবার বিদ্যাও তারা আয়ত্ত করতে পারে নি। শিক্ষিত ব্যক্তির হাতের লেখা সুন্দর হওয়া চাই, তার শিল্পসাহিত্যবোধ হওয়া চাই, এসব বস্তুবা বাতুলের প্রলাপ নয় কি ? আর মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কের কথা তোলাটা অধুনা প্রতিক্রিয়াশীলতারই অপর নাম!

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তাত্ত্বিক বর্ণনা দিতে হলে বলতে হয়—এই ব্যবস্থা জ্ঞানপ্রধান, পুস্তকপ্রধান এবং শিক্ষকপ্রধান। কিন্তু যে যুগে আসছে সে যুগে "কেবল জ্ঞানে"-র দ্বারা (বিশেষত যে জ্ঞান শ্রমশিল্প, বিজ্ঞান, কৃৎকৌশল সম্পর্কে উদাসীন) কাজ হবে না, শিক্ষক ছাত্র কারোরই পূর্ণবিকাশও হবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষক যে 'কাজ' করেন সেটি হল : ছাত্রদের মনে (মগজে ?) "জ্ঞান ঢুকিয়ে" দেওয়া। জ্ঞানলাভ করবার শক্তি উৎপন্ন করা জ্ঞানপিপাসার উদ্রেক করার মাপকাঠিতে, প্রথাবদ্ধ শিক্ষার পক্ষে বলার বিশেষ কিছু নেই।

৭

আজ আমরা সত্যই বিকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। যে ছাত্র প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েছে, প্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে সেও শ্রমমর্যাদা তো দূরের কথা, আত্মমর্যাদাও হারিয়ে বসেছে। সে চায় একটি চাকরি। একথা বি-এ এম-এ-দের বেলায়ও সত্য। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হয়েছে, কোথাও বা কদর্যকুৎসিত রূপ নিয়েছে। এই ব্যবস্থায় নৈতিক পরিবেশ নেই, জ্ঞানকর্মসাধনার চেষ্টা নেই, বিদ্যার প্রতি সম্মান নেই, শ্রমের মর্যাদা নেই, এবং স্বাধীন মনোবৃত্তির কোনো মূল্য নেই। ওইসব সত্ত্বেও বহু লোক বলেন যে, "এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই যথাসম্ভব অভীষ্ট লাভ করতে হবে।" তাই দাবি ওঠে, আরও স্কুল, আরও কলেজ, আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করো, নচেৎ শিক্ষাসংকোচনের দায়ভাগ নাকি বহন করতে হবে। অথচ এও তো সত্য যে, একদিকে কোটি-কোটি লোক অন্ধের মতো কাজ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে লক্ষ-লক্ষ ছাত্রকে বিজ্ঞান- ও কর্ম-

নিঃসম্পর্কিত নিরুদ্দেশ্য, অবান্তর শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন মুখে আমরা সবাই চাই। কিন্তু আমরা সবাই এমন জালে জড়িয়ে পড়েছি যে, এই জাল কেটে বাইরে আসা খুবই শক্ত। এবং পরিবর্তনের কথা উঠলেই বিচলিত বোধ করি।

এদেশে প্রতিরক্ষার পরেই শিক্ষায় ব্যয় হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো গৌরবের সঙ্গে প্রচার করেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষার জন্য ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষার অর্থনীতি (ইকোনমিকস অব এডুকেশন), শিক্ষার উৎপাদন-সামর্থ্য ও গুণগত মান বিচার করলে খরচের খাতা ভরে উঠবে, জমার খাতায় পড়বে শূন্য।

৮

দলিলে বলা হচ্ছে শিক্ষাকে জাতীয় বিজ্ঞানধারার সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মেলাতে হবে—শিক্ষাকে হতে হবে 'প্রাসঙ্গিক'। নানা স্তরে, নানা ক্ষেত্রে, কৃষিতে, শিল্পে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, পরিবহণে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্য-বিভাগে, প্রশাসনে, গবেষণায়, যে বিশেষ-বিশেষ 'যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী' প্রয়োজন, সেই দক্ষ কর্মী-দল গড়ে তোলাটাই হবে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। মানুষ গড়াটাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য নিশ্চয়ই; কিন্তু মানুষের অন্য মূর্তির কথা মনে রেখে উৎপাদক (প্রোডিউসার) হিসাবে, ভোক্তা (কনজিউমার) হিসাবে এবং নাগরিক (সিটিজেন) হিসাবে তাকে গড়ে তোলাটাই হবে বর্তমান কালের দায়িত্ব। অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে সামগ্রিক জাতীয় পরিকল্পনাকে মেলাতে হবে। এবং পরিকল্পনার স্বার্থে সীমিত সম্পদ লগ্নীর বেলায় অগ্রাধিকার, মধ্যমাধিকার এবং নিম্নাধিকার বিচার করতে হবে। অধিকারবৈকল্যবাদীদের জানাতে হবে সাফ কথা—"অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর অতিরিক্ত এবং ওই কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক বিকাশেরও অতিরিক্ত, অনৈতিহাসিক কোনো 'অধিকার' নেই।" স্থান, কাল, পাত্র, সমাজবাস্তব—এই-সব বিচার করেই অধিকার-অনধিকারের আলোচনা।

সন্দেহ নেই, শিক্ষার খাতে পরিকল্পিতভাবে, অর্থ-লগ্নী করতে হবে, ক্রমশ লগ্নীর পরিমাণ বাড়াতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বেতনখাতে, পরিচালনখাতে, রুগ্ন বিদ্যায়তন স্থাপন করে, অর্থের ৭০ ভাগ বা ততোধিক ব্যয় হলেই "শিক্ষার অগ্রগতি" হল বলতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদকে (যেমন খনিগর্ভে কিংবা সমুদ্রের তলায় যা আছে) আহরণ করে তাকে ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর রূপে না দিলে তা যেমন মূল্যহীন, তেমনি মানবসম্পদ যদি দক্ষ 'শ্রমশক্তি' (কায়িক ও বৌদ্ধিক) না হয়ে ওঠে, তবে সে সম্পদও মানবপুঁজির পর্যায়ে ওঠে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা মানবপুঁজি অর্থাৎ, নানাস্তরের কর্মী গড়ে তুলতে এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছি। বিদ্যায়তন-নামক কারখানা থেকে যা উৎপন্ন করেছি তার নাম প্রধানত কেরানি, এবং অংশত মাস্টার, এনজিনীয়র, ডাক্তার, উকিল, প্রশাসক ইত্যাদি। দেশগঠনের যে নানা বিচিত্র কাজ, সেই বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বিশেষত যে 'কমপিউটর-যুগে' আসছে, তার দাবির কথা মনে রেখে, শিক্ষা-কাঠামোর কিংবা শিক্ষণীয় বিষয়ের এমনকি শিক্ষণপ্রশাসনের রূপান্তর ঘটাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এই গুরুতর সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাই বর্তমান দলিলের অভিনবত্ব।

ভারতের বিপুল অশিক্ষিত জনগণকে সাক্ষরতার পর্যায়ের ভিতর দিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নত মানে নিয়ে আসা—মাধ্যমিক স্তরে আধুনিক বৃত্তিমূলক—সর্বার্থ-সাধক কৃৎকৌশলমুখী (পলিটেকনিক্যাল) শিক্ষা চালু করা, উচ্চশিক্ষাকে উৎকর্ষমণ্ডিত এবং আধুনিক করে তোলা শুধুমাত্র প্রচলিত বিদ্যায়তনগুলির দ্বারা কি সম্ভব? প্রথাসিদ্ধ স্কুলকলেজের মধ্য দিয়েই কি জ্ঞান-বিস্ফোরণের এই যুগে সর্বজনীন শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সাক্ষরতা অভিযান প্রভৃতি পূর্ণতা লাভ করতে পারে? শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার সংহতিতে আধুনিক বিজ্ঞান তথা কৃৎকৌশলের সহায়তা কি অপরিহার্য নয়? এইসব প্রশ্ন উত্থাপনেই দলিলটির সার্থকতা।

"The task of evolving a long-term strategy for education in which the requirements of universalisation of elementary education; production of sophisticated manpower in adequate numbers to deal creatively with new technologies; diversified vocationalisation; and the creation of an over-all environment for change and development through adult and continuous education would be integrated with measures to improve the quality and outputs of all other educational sections."

দলিলটির নিহিত বক্তব্য এই: বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার পরিধি এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রত্যেক দশকেই "জ্ঞানের ভাণ্ডার" উপচে পড়ছে। এই সুবিশাল, ক্রমবর্ধমান ভাণ্ডারকে কোনো সময়সীমায় আবদ্ধ পাঠ্য-সূচী এবং সিলেবাসের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়। কোনো শিক্ষকের পক্ষেই নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মধ্যে কোনো বিষয়ের "জ্ঞান" পৌঁছে দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান শুধু ক্লাস-ঘর-সর্বস্ব বক্তৃতাদান-পদ্ধতির মাধ্যমে হবে না। এ যুগে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বেড়েছে, আরও বাড়বে। তেমনি, এ যুগে পঠন-পাঠন-গবেষণার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে গেলেই বার্তাসমৃদ্ধ টেকনোলজির সহায়তা নিতে হবে (উঁচু, নীচু, মাঝারি)। কমপিউটার ব্যবহার করতে হবে, দূরদর্শনকেও ব্যবহার করতে হবে—জ্ঞানের বাহন হিসাবে। অর্থাৎ বিদ্যালাভ এবং জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে নতুনভাবে, নতুন উপকরণের সাহায্যে।

পূর্বে আমরা গুরুর কাছে 'বিদ্যা' পেতাম। ঐতিহ্যানুসারী 'জ্ঞান' এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হত। তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিস্তৃত এবং বিচিত্র হয় নি, এবং আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব এবং মনের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধও ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। দিনের মধ্যে কয়েকঘন্টাব্যাপী যে বিদ্যাশিক্ষা, সেই বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে প্রথাবহির্ভূত, আত্মশিক্ষার (সেলফ-এডুকেশন-এর) সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যালয়ের সঙ্গে চার-দিকের যে বিচ্ছেদ, আজ তা ঘোচাতে হবে। সেই কাজ করার 'উপকরণ' আজ বিজ্ঞান আর কৃৎকৌশলের আনুকূল্যে আমাদের হস্তগত। আমাদের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে এর বিরোধ আছে। আমরা স্কুল-কলেজ-নামক কারখানা চাই। মাস্টারমশাই, ছাত্র এই কারখানারই এক-একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজিয়ে কারখানা খোলে। কল চলতে থাকে। মাস্টারমশাইদের মুখ চলতে থাকে। সান্ধ্য বিভাগ না থাকলে কল পাঁচটায় বন্ধ হয়। কারখানায় যেমন ধর্মঘট হয়, ঘেরাও হয়, অগ্নিসন্ত্রাবী বক্তৃতা হয়, মিছিল-অভিযান হয়, তেমনি আমাদের স্কুল-কলেজ-কারখানাতেও হয়। ছাত্ররা এই কলেজছাঁটা দু-চার পাতা বিদ্যা নিয়েই খুশি থাকে। আসলে তো পরীক্ষা-বৈতরণী পার হওয়াতেই এই বিদ্যার সার্থকতা! তবে আমরা সনাতনী প্রথা-প্রকরণ বর্জন করতে নিতান্তই অনিচ্ছুক।

৯

দলিলটিতে বলা হচ্ছে, প্রথাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা চলুক। তবে এর সঞ্চালকশক্তি ও সহায়ক হিসাবে নতুন "স্ট্রাটেজি"ও নেওয়া হোক। এই স্ট্রাটেজির মাধ্যমে কোটি-কোটি মানুষের কাছে নিত্যনতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার 'নিয়ে যাওয়া' ও উন্মুক্ত করা সম্ভব। ক্লাস-ঘর-নির্ভর 'বক্তৃতাপদ্ধতি' চলুক। তার সঙ্গে যুক্ত হোক রেডিও-দূরদর্শন, কমপিউটর-সহযোগে স্ব-শিক্ষার পদ্ধতি। ফরমাল শিক্ষাব্যবস্থা চলুক। কিন্তু প্রথাবহির্ভূত কেজো, জীবনধর্মী শিক্ষারও আয়োজন হোক আধুনিক উপকরণের সদ্ব্যবহার করে। লোকশিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্ক-শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য এবং সর্বতোমুখী জাগরণ সুনিশ্চিত করতে হলে একদিকে যেমন প্রাচীন গণমাধ্যমগুলির সহায়তা নিতে হবে—যাত্রা, রতকথা, ছড়া প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মকে ও আনন্দকে মেলাতে হবে, তেমনি আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে বিকল্প ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে:

দলিলে তাই (১) দূরগত শিক্ষা (ডিসটেনস লারনিঙ), (২) যন্ত্রগণক সাক্ষরতা (কমপিউটার লিটারেসি), (৩) বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা, (৪) দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা, (৫) করেসপনডেনস স্কুল ও কলেজের সহায়তায় শিক্ষা, (৬) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (ওপন ইউনিভারসিটি) সহায়তায় শিক্ষার আয়োজনের কথা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিকাশশীল অনেক দেশে, এবং অনেক উন্নত দেশেও,—এইসব পদ্ধতি-প্রকরণের বহুল ব্যবহার ইতিমধ্যেই সুফল প্রসব করেছে।

১০

দলিলটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সপক্ষে একটি মূল্যবান প্রতিবেদন। দলিলটির প্রণেতাদের ভাবনায় যে কথাটি প্রচ্ছন্নভাবে আছে সেটি এই : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়-যাত্রাকে আটকে দেওয়া কোনো দেশেই সম্ভব নয়। যন্ত্র-শিল্প যেমন চরকাকে ভারত তথা পৃথিবী থেকে প্রায় বিদায় দিয়েছে, চিনির কলগুলি যেমন গুড়যজ্ঞের বনিয়াদকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলেছে, মোটর-গাড়ি যেমন ঘোড়ার গাড়ি এবং তৎসংলগ্ন ছোটো ব্যাবসাকে প্রায় অবলুপ্তির পথে নিয়ে গেছে, তেমনি শিক্ষার গণমাধ্যম-গুলিও সাবেকি পদ্ধতিপ্রকরণকে অনেকখানি অ-প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। আজ যেমন পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সমতলভূমির উপর টেলিগ্রাফ-খুঁটি পুঁতে-পুঁতে, অগ্রসর হয়ে, বার্তাবিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় নয়, উপগ্রহের সাহায্যে সারা দুনিয়ার বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, তেমনি আজ চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শন, যন্ত্রগণক প্রভৃতির সাহায্যে ভারতের সর্বত্র জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে "হাজির হওয়া" সম্ভব। যুগটাই যে বার্তাসমৃদ্ধ ও কৃৎকৌশলনিবিড়। এইসব গণমাধ্যম কিভাবে কতটা ব্যবহার করা যাবে, কতটা করা উচিত, তা নিয়ে বিদ্বানরা আলোচনা করবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু যন্ত্রভাঙানিয়াদের দলে নাম লিখিয়ে, এমন কি বাম-পন্থার জিগির তুলেও, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগন্নাথের রথকে আটকানো যাবে না।

বামপন্থী মহলে তো বটেই, অনেক সৎ শিক্ষাব্রতী মহলেও ধারণা আছে যে, ক্লাস-ঘর-নির্ভর, মাসটার-প্রধান, সাবেকি শিক্ষাব্যবস্থাই যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, বিশেষত দূরদর্শন ও যন্ত্রগণকের উপর নির্ভরশীল ব্যবস্থাটা শুধু দামি ভূষণই। কিন্তু নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, দূরদর্শন-শিক্ষা ভালো ফল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত খরচও এই ব্যবস্থায় কম।

দলিলে একথা বলা হয় নি যে, ভারতবর্ষে শিক্ষক-শিক্ষণ বাদ দিতে হবে, শিক্ষার উপকরণের সরবরাহ থেকে ছুটি নিতে হবে, শিক্ষণীয় বিষয়কে আধুনিক তথা শক্তিশালী করবার প্রয়োজন আর নেই। দলিলে বলা হয় নি যে, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার আজ আর কাম্য নয়। এ কথাও বলা হয় নি যে, শিক্ষার 'গুণগত মান' সম্পর্কে উদাসীন থেকেও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রশ্ন এবং বিকল্প দুটি। **এক** : সাবেকি স্কুল-কলেজ-প্রধান, পুস্তক-প্রধান, বক্তৃতা-প্রধান, পরীক্ষা-প্রধান পথে অগ্রসর হওয়া। **দুই** : অসাবেকি প্রথার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া। সাবেকি প্রথায় সব শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় নি, যাবেও না। অসাবেকি প্রথায় হয়তো শিক্ষার ভোজে সকলকে আমন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। হিসাব করলেই দেখা যাবে, সাবেকি স্কুলপ্রথায় ভারতের কোটি-কোটি শিশুকে, কোটি-কোটি মানুষকে আগামী দশকেও শিক্ষার ভোজে আমন্ত্রণ করা যাবে না, যদি না ইতিমধ্যে আমরা নতুন পদ্ধতি-প্রকরণকে বরণ করে নিই।

১১

আসলে দলিলটির "প্রেক্ষিত" সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দুই দৃষ্টিভঙ্গি—দুই দর্শন থেকে উদ্ভূত। একদিকে এই মত যে, প্রতি মুহূর্তে বিশ্ব নষ্ট হয়ে নতুনভাবে উৎপন্ন হচ্ছে। একদিকে—পুরাতনকে "তং কুতোত্থ লব্ধা" (এখানে তাকে কিভাবে আর পাওয়া সম্ভব) আখ্যা দিয়ে নতুন উৎসাহে নতুন পথে চলবার প্রয়াস। অন্যপক্ষে—সনাতনী, চিরস্থবিররা পৃথিবীতে ফিরে যাবার প্রয়াস ; অন্তত "যা আছে" তাকে স্থিতিশীল করবার চেষ্টা। দ্বিতীয় দর্শনের দাবি—প্রাক-শিল্পায়িত যুগে ফিরে যাও। একদিকে এই মত যে, শিক্ষায় যে "পদ্ধতি-প্রকরণ" ব্যবহার করতে হয়, তা নৌকার মতো। নদীপার হবার জন্য তাকে কাজে লাগাতে হয়। ফুটো নৌকা যদি কাজে না লাগে, তবে নতুন নৌকা ব্যবহার করতে হবে। পর-পারে পৌঁছে নৌকাটিকে ঘাড়ে করে নেবার কোনো সার্থকতা নেই। অপর পক্ষে এই মত : নৌকায় পারা-পার করতে আমরা শিখেছি। ফুটো হলে ঝালাই-সারাই করে নৌকাযানই ব্যবহার করা উচিত। অন্য কোন নৌকা কিংবা যানের কথা ভাবা নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ভারতের বামপন্থীরা দ্বিতীয় মতেরই সমর্থক।

১২

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি বর্তমান। আর্থিক অনটন, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, নেতৃত্বদানে অক্ষমতা, প্রথা-গত মনোজাগতিক বিশ্বাস এবং সংস্কারের পিছুটান, কেন্দ্র-রাজ্য-সংঘাত, শিক্ষার ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত ঔদাসীন্য প্রভৃতি অসংখ্য নঙর্থক উপাদানের ফর্দ করা শক্ত কাজ নয়। আরও কতকগুলি প্রতিবন্ধকের কথা দলিলে আলোচিত হয়েছে। অহৈতুকী ডিগ্রীধারীর বন্যা এবং ডিগ্রীর সঙ্গে দক্ষতা-কুশলতা (স্কিল) এবং কর্ম-সংস্থানের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ। সারস্বতভবনে রাজ-নীতির মত্তগজের দাপাদাপি ইত্যাদি। প্রসঙ্গত কয়েকটি "উপসর্গ নিরাময়ে"র কথাও আছে। রোগ গভীরে, শুধু উপসর্গ-নিবৃত্তিতে স্থায়ী ফললাভ হবে না, এও সত্য। কিন্তু এও সত্য, স্থায়ী চিকিৎসার পূর্বে তাৎক্ষণিক বেদনাপ্রশমনও চিকিৎসারই অঙ্গ। সনাতনী পূর্বপক্ষ (বাম ও দক্ষিণ) দলিলটির দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক বিচার-ধারা সম্পর্কে আলোচনায় তেমন তৎপরতা দেখান নি। তৎপরতা দেখিয়েছেন প্রান্তিক বিষয়ের আলোচনায়। এবং বহু সময়ে তাঁরা হয় বুঝে কিংবা না-বুঝে অনৃতভাষণ হতেও ক্ষান্ত থাকেন নি।

১৩

কোনো কোনো মহল থেকে মুখরভাষণ শোনা যাচ্ছে যে, নতুন সম্ভাব্য শিক্ষানীতির প্রতিবেদনের পিছনে রয়েছে বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থ। ওই স্বার্থরক্ষার তাগিদেই কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন প্রচেষ্টা। সত্য কথা, ভারত-সরকারের ইলেকট্রনিকস বিভাগের নীতির সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে কম্পিউটর শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের অংশীদারত্বের সুযোগবৃদ্ধি হয়েছে। সেই নীতির সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও (যার সঞ্চালক শক্তি কম্পিউটার- ও অটোমেশন-বিরোধী মার্কসবাদী কমিউনিসট পার্টি) যৌথ উদ্যোগে কম্পিউটর তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে ওয়েবেল কম্পিউটার লিমিটেডের পুনর্গঠন করেছেন। কম্পিউটর-বিপ্লবের অনিবার্যতা স্বীকৃতির প্রমাণ আরও অনেক উদাহরণসহযোগে দেখানো সম্ভব। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের কথা বললেই লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

সনাতনীরা (বাম ও দক্ষিণ) আরও বলেন, দলিলের উদ্দেশ্য সৎ নয়। কারণ শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ, বেসরকারি উদ্যোগের কাছে আত্মসমর্পণ (প্রাইভেটাই-জেশন), আমলাতন্ত্রীকরণ, (ব্যুরোক্র্যাটাইজেশন) প্রভৃতি নতুন প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির অভীষ্ট। শুধু তাই নয়। ক্যাপিটেশন-ফী-প্রথা (অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের তহবিলে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে ছাত্র-ভরতি-করানো) বহাল রাখাই এই নীতির অঘোষিত লক্ষ্য। সংক্ষেপে বলা যায়, এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা এবং দলিলটির বয়ান পাঠ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মন্দবুদ্ধিদের পক্ষেই সম্ভব।

দলিলে আছে, শিক্ষাকে কিভাবে সংকীর্ণ, দলীয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করা যায়, তা দেশ-বাসীর ভেবে একটা ঐকমত্যে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি।

গত তিরিশ বছরের, বিশেষত গত কুড়ি বছরের শিক্ষাজগতের ইতিহাস প্রমাণ করে, যে বন্ধ্যা, জীবন-ধ্বংসী রাজনীতির দৌরাত্ম্যে সারস্বতভবন আজ বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয় সারা ভারতেরই বৈশিষ্ট্য, বিশেষত পূর্বাঞ্চলের। সংবাদপত্রের পাতায় রোজই দেখা যাবে বিদ্যায়তনের অপবিত্রকরণের নানা কাহিনী। কর্মবিরতি, স্ট্রাইক, ধীরে চলো, ধরনা, অবস্থান, মিটিং ভণ্ডুল করা, ঘেরাও, বিদ্যায়তনের ক্লাসঘরের দেওয়ালে—অন্দরমহলে—এবং বাইরে-পোসটার—দেওয়াল-লিখনের কুৎসিত দৃশ্য—এমনতরো 'অপসংস্কৃতি' শিক্ষার রাজ্যে আজ স্থায়ী আসন নিয়েছে। তা ছাড়াও আছে রাজ-নীতির নামে নন্দীভৃঙ্গীর নৃত্য, কালাপাহাড়িয়ানা—টোকাটুকি, বিনয়ভঙ্গ, অসদাচার, বেনিয়মী উচ্ছৃঙ্খলতা, শিক্ষক-প্রহার, উপাচার্য, সহ-উপাচার্যদের অসম্মান, কখনো-কখনো বা দৈহিক নিপীড়ন। আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে এসব অভিজ্ঞতা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের এতই প্রত্যক্ষগোচর যে অতিবিস্তারের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সনাতনীদের—বিশেষত "বাম-সনাতনী"দের—"ডি-পলিটিসাইজেশন"-এ মহা আপত্তি। এটা নয় যে, সংবিধান সংশোধন করে নাগরিক অধিকার খর্ব করবার প্রস্তাব এসেছে। এটাও নয় যে, মত প্রকাশের, দল-গঠনের, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষকসমিতি কিংবা কৃষকসভা গঠনের অধিকার খর্ব করবার প্রস্তাব এসেছে। বলা হচ্ছে, সব ব্যাপারেই স্থান-কাল-পাত্র বিচার করতে হয়।

পরিবারে কিংবা ধর্মস্থানে, কিংবা ধর্মাধিকরণে যেমন রাজনীতি করবার প্রয়াস নিন্দনীয়, অর্থাৎ এইসব এলাকা "রাজনীতি-অতিরিক্ত", বিদ্যায়তনও তাই। গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনীতির তো অনেকে ক্ষেত্র থাকে। নানা দলের, নানা মতের সংঘাত থাকে। জনসমর্থন পেলে কোনো বিশেষ দল, কিংবা ফ্রন্ট—জেতে—ক্ষমতায় আসে। রাজনীতির লক্ষ্য "ক্ষমতা"—পাওয়ার। শিক্ষার রাজ্যের অভীষ্ট স্বতন্ত্র—"জ্ঞানার্জন, জ্ঞানান্বেষণ, এবং জ্ঞানের বিস্তার"। জ্ঞানের জগৎ ও রাজনীতির জগৎকে একাকার করে ফেললে দুইয়েরই ক্ষতি।

দলিলে "রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষা" এবং "শিক্ষার রাজ্যে রাজনীতি"-র মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথমটি প্রয়োজনীয়, দ্বিতীয়টি বর্জনীয়। শিক্ষকের রাজনৈতিক-সামাজিক বিশ্বাস, ভোটের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, পছন্দমতো পুস্তক পাঠের অধিকার বর্জনের আহ্বান দলিলে নেই। ছাত্রের রাজনৈতিক অধিকারে নাকগলানোর প্রস্তাবও দলিলে নেই। বলা আছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বকীয় ধর্মসাধনার—অর্থাৎ জ্ঞানবিস্তার ইত্যাদির—পথ ধরে চলবে। শিক্ষাবহির্ভূত কোনো শক্তি তার স্বধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করবে না। তাৎকালিক রাজনীতির অভিঘাত থেকে বিদ্যায়তনকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, সে ভাবনা আজ সকলেরই। দলিলে প্রস্তাব আছে ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলায় "পথপ্রদর্শক" একটি করে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। এই ধরনের স্কুল গড়ে ওঠবার আগেই এখনও বাস্তব অবস্থা এই যে, কোনো স্কুল ভালো, অনেক স্কুল নিম্নমানের, অসংখ্য স্কুল মাঝারি। "ভালো-মাঝারি-মন্দ"-ভেদ দুরাত্মারা অথবা এলিটিসটরাই শুধু করে না, অভিভাবক এবং জনসাধারণই করে। তবে "ভালো" স্কুলের অধিকাংশই কেন্দ্রীভূত শহরাঞ্চলে। দলিলটির প্রতিবেদনে তাই মফসসলে "মডেল স্কুল" স্থাপনের প্রস্তাব আছে। এই স্কুলে বিত্তবানদের ছেলেরা বৈভবের জোরে প্রশোধিকার পাবে না, প্রবেশাধিকার থাকবে দরিদ্র ঘরের সন্তানদের। মামার জোরে, কিংবা মন্ত্রী-আমলাদের 'কোটা'র ভিত্তিতে এখনকার ভরতি-নীতি চালিত হবে না, হবে "মেধা" বিচার করে। সনাতনীদের এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি। এই প্রস্তাব নাকি বড়োলোকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। মডেল স্কুল চালু করা মানেই তো "শ্রেণী-বিভাগ" বহাল রাখা। সব স্কুলকে একই দিনে "আদর্শ" হিসাবে গড়ে না তুলে, কয়েক শ স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য হীন নয় কি? সনাতনীরা সব জেনেশুনেও বোকা সেজে আছেন। ইংল্যানডে কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নেও "ভালো" স্কুল, "ভালো" কলেজ, "ভালো" বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অকসফোর্ড, কেমব্রিজ-এর যে মর্যাদা, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তা নয়। মসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্যাদা, লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তা নয়। আমাদের রাজ্যে সাউথ পয়েনট কিংবা নরেন্দ্রপুরের যে মর্যাদা, অন্য স্কুলের তা নয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে "ভালো স্কুল"—আদর্শ স্কুলের অভাব। গ্রামের ভালো ছেলেদের খুঁজে বের করে আদর্শ স্কুলে ভরতি করবার "নীতি" একথাপ অগ্রসর হবারই নীতি। কিন্তু সনাতনীদের বেলায়—এখানেও "উলটা বুঝলি রাম"। তাদের যুক্তি—হয়, একই দিনে, সুস্থ-রুগ্ণ, সক্ষম-অক্ষম, ভালো-মাঝারি-নির্বিশেষে "সব" স্কুলকে "আদর্শ"—পথপ্রদর্শক করে তোলা, সব স্কুলের জন্য সমান খরচা করা, নয়তো কিছুই না করা। শিক্ষানীতির এটাই নাকি "গণতান্ত্রিক" পরাকাষ্ঠা। এই উদ্ভট "গণতান্ত্রিক নীতি" দুনিয়ার কোনো দেশে—কি পশ্চিমী গণতন্ত্রে, কি সোভিয়েত গণতন্ত্রে, কি নয়াগণতন্ত্রে—কৃচ্চাপি নেই। এই ভারতীয় সনাতনী "গণতন্ত্র" শিক্ষার রাজ্যে চালু না করলে কেন্দ্রীয় সরকারের নাকি বিশেষ প্রত্যবায় হবে!

ভয় হয়, আমাদের মতো "নরম" রাষ্ট্রে দলিলটির দশা কী হবে! বাম ও দক্ষিণদের ভয়ে কোঠারি কমিশনের মূল্যবান সব নির্দেশ লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়েছে। যেই "শিক্ষায় উৎকর্ষ ও মানে"র কথা উঠেছিল, উঠেছিল মুখ্য (মেজর) বিশ্ববিদ্যালয়, স্বশাসিত (অটোনমাস) কলেজের কথা—১৯৬৪ সালে—কোঠারি কমিশনের ভিত্তিতে। অমনি রক্ষণশীল শক্তি আসরে নেমে পড়েছিল। অটোনমি এবং দায়বদ্ধতার (অটোনমি অ্যানড অ্যাকাউনটেবিলিটি)-র কথা কোঠারি কমিশনে আছে। বর্তমান দলিলেও আছে। রক্ষণশীল, স্বার্থান্বেষীদের দাবি—অটোনমির নামে প্রগল্‌ভ সার্বভৌমত্ব। আর সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা তুললেই গগনভেদী চিৎকার—"বিদ্যায়তনের এবং শিক্ষকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের চক্রান্ত হচ্ছে।"

এই অপপ্রচারের ধুম্রজালে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, দলিলের মূল্যবান প্রতিবেদনের অনেক বক্তব্য হয়তো ঢাকা পড়বে, সংশোধিত হবে, কিংবা বাতিল হবে, কিংবা যাবে নেপথ্যে। আবার ২০০০ সালে মিলবে নতুন প্রতিবেদন—"আমরা গত কুড়ি বছরে শিক্ষার রাজ্যে কোনো মৌলিক রূপান্তর আনতে পারি নি।"

ঐতিহ্যানুসারী সমাজের রূপান্তর তো সহজ নয়।

ভ্রম সংশোধন

জানুয়ারি সংখ্যার ৭২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'জল' কবিতায় দুটি পঙ্‌ক্তিতে মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। শুদ্ধ পাঠ দেওয়া হল।

৫ম-৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তি : করে সারাদিন। নিঃসপত্না নয়, আপাত অর্থহীনতা ঘিরে থাকে/চারিদিকে আমার ; আর থাকে জলের গভীর কালো সখ্য।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ছয়

...খানবাহাদুর দবির-উদ্দিন চলে যাওয়ার পরই পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। কারণ, পৃথিবীর ঘৃণ্যতম পদার্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে জানতাম এই লোকটিকে। আর বারু চৌধুরির মুখে শুনতে-শুনতে মুখস্থ-হয়ে-যাওয়া সেই সতেরো-শতকী ইংরেজি পদ্যটি প্রতিধ্বনিত হত তার কথা মনে এলেই : Man's like the earth, his hair like grasse is grown/His veins the rivers are, his heart the stone ! স্বীকার করতে বাধ্য, কোনও এক প্রস্তরীভূত মুহূর্তকে এই পদ্যবন্ধ বুঝি ছুঁয়ে আছে, কিংবা ধরা আছে এর মধ্যে আমার মতোই মানুষের চেরা গলার আর্তনাদ, যা শুনে কাল মধ্যরাতের রোগা শান্ত্রীটি তার লম্বা নাক সেলের গরাদের ফাঁকে ঢুকিয়ে কুতকুতে চোখের মমতা দিয়ে আমাকে দেখছিল!

খানবাহাদুর চলে গেলে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে আব্বার আরবি শ্লোকপাঠের মতো পদ্যটি মনে-মনে আওড়ানোর পরই একটি 'মোজেজা' ঘটল। হঠাৎ দেখলাম, নিরেট স্তব্ধ ফ্যাকাশে দেয়াল কুয়াশার মতো নীলচে হতে-হতে অবিশ্বাস্য রোদের তীব্রতায় মিলিয়ে গেল। আর হলুদ কৃষ্ণচূড়ার জঙ্গল, নবাবি মসজিদের গম্বুজ, হরিণ-মারা প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলের সামনেকার ত্রিকোণ শীর্ষভাগ, যাকে হেডমাসটার বিষ্ণুচরণ রায়-স্যার বলতেন ইতালীয় স্থাপত্যের অনুকরণ—'তুমি হাজারদুয়ারি প্যালেস যদি দেখে থাকো লালবাগ শহরে, দেখবে নবাব-বাহাদুর হুমায়ুন জাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি।' আসলে আমি তখন ষোলো বছর বয়সের সেই শরীরকে দেখতে পাচ্ছি। আমার সেই মায়া-শরীরকে দেখে বুঝতে পারছি, তার দণ্ডিত ভবিষ্যৎ, তার জঘন্যতম কীর্তিকলাপ, হত্যাকাণ্ড, তার নারীকে ভালোবাসার এবং অবাধ রমণে লিপ্ত হওয়ার মুহূর্তগুলো, তার রাজনৈতিক বিদ্রোহ, তার ধর্মকে-লাথি-মারা নাস্তিক্য—সবকিছুই ওই পরা-বাস্তবতাময় কুয়াশার মধ্যে মুছে গেছে। ঘন্টা বাজছে। স্কুলের ছুটির ঘন্টা। ঘন্টা বাজছে। দেওয়ান বারু চৌধুরির হাতির গলার ঘন্টা। ন্যাংটো, আধন্যাংটো ছেলেপুলে আর তাদের গতরজীবী বাবা-মায়েরা ভিড় করে চলেছে হাতির পেছনে। তারা সুর ধরে ছড়া গাইছে : 'হাতি তোর গোদা-গোদা পা/হাতি তুই নেদে দিয়ে যা'। আর আমার অবোধ গ্রামীণ সারল্যভরা ষোলো বছর বয়সের কলজেটুকু নতুন এক আবেগে মুহুর্মুহু শিরশিরিয়ে উঠছে। তারপর হাতিটি হাঁটু ভাঁজ করে বসল আর বারুমিয়া দেওয়ান মিটিমিটি হেসে বললেন, আয় শফি। দুরুদুরু বুকে আমি হাতির হাওদায় উঠলে বারুমিয়া আমাকে সামনে বসিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। হাতির মাহুত কীসব আওয়াজ দিতে থাকল। আর বিশাল কালো জন্তুটি উঠে দাঁড়াল। দুনিয়া টলতে লাগল। আমার চোখে সেই দুলন্ত দুনিয়াই ইতালীয় স্থাপত্যের অনুকরণ, ভিড়, হইহল্লা, নবাবি মসজিদের গমবুজ, জমিদার বিজয়েন্দুনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র সৌম্যেন্দুনারায়ণ—যাকে ক্লাসে সবাই হাবুল বলে ডাকত, তার দুচোখের তাচ্ছিল্য পর্যন্ত দুলছিল, কাঁপছিল, দূরে সরে যাচ্ছিল। আর বারুচাচাজি যখন জিগ্যেস করলেন, তোর কি ভয় করছে শফি, আমি জোর গলায় বললাম, না। তখন বারুচাচাজি বললেন, ভয় পাস নে। এ হাতি সেই হাতি নয়। হরিণমারা গ্রাম ক্রমে পিছনে চলচ্চিত্র হতে-হতে ঘন নীল-ধূসর পোঁচে পরিণত হলে একবার জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন চাচাজি? বারু চৌধুরি বললেন, নেচারের ভেতর।

বারুচাচাজি হাসছিলেন। শফি, এটা কী দেখতে পাচ্ছিস? বলে হাওদার পাশ থেকে যে লম্বাটে জিনিসটা বের করলেন, শিউরে উঠে দেখলাম সেটা একটা বন্দুক। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ করলাম, বারুচাচাজির পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে ছাইরঙা হাফ শার্ট, মাথায় শোলার টুপি। অমনি আমার গা ছমছম করল। মনে পড়ছিল, নবাব-গঞ্জে থাকার সময় ঠিক এই পোশাকপরা একটি লোককে দেখে গ্রামের সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে মাঠে-বনে-বাদাড়ে গিয়ে গাঢাকা দিয়েছিল। ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিদের কী ভয় না করত লোকেরা!

বন্দুকের নলে আঙুল ছোঁয়াতেই টের পেলাম অসাধারণ ঠান্ডাহিম, যদিও সেটা শীতঋতু নয়। তারপর বললাম, আপনি কেন এ পোশাক পরেছেন চাচাজি?

বারুমিয়া একটু হেসে বললেন, উলুশরার মাঠে বাঘ আছে শুনেছি। তবে বাঘের চেয়ে সাংঘাতিক জানোয়ার কী জানিস? মানুষ।

অবাক হয়ে বললাম, কেন?

আসলে তখনও সাংঘাতিক কোনো মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। বন্দুপিরের সন্তান হিসেবে যত মানুষ দেখেছি, তারা বিনত, নম্র, মৃদুভাষী। তারা হিন্দু হলে কপালে হাত ঠেকিয়ে 'আদাব' বলেছে, মুসলিম হলে 'সালাম' অথবা 'আস্সালামু আলাইকুম' সম্ভাষণ করেছে। আমি লালপাগড়িমাথায়, খাকিপোশাকপরা পুলিশ দেখেছি, দারোগা দেখেছি। তারা লোকের কাছে যত ভয়াবহ হোক, আমি তাদের কখনও ভয় পাই নি। কারণ তারা কেউ-কেউ আব্বাকে সম্মান জানিয়েছে এবং তাঁর দোয়া-ফোঁকা জলও পান করেছে। এইসব কারণেই আমি বারুচাচাজির কথায় চমকে উঠেছিলাম। আর জবাবে বারুচাচাজি আস্তে বললেন, আমি নবাববাহাদুরের দেওয়ান জানিস তো? মহলে-মহলে গিয়ে নায়েবদের খাজনার তহবিল জমা নিই। এই হাওদার তলায় সেইসব টাকাকড়ি আছে। তাই কয়েকবার ডাকাতরা হামলা করেছিল।

হ্যাঁ, ডাকাতরা সাংঘাতিক মানুষ আমি জানতাম। তাই চুপ করে থাকলাম। এই সুবিশাল কালো জানোয়ার আর এই ঠান্ডাহিম বন্দুকের নল ডাকাতদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভেবে ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। কিন্তু এতক্ষণে লক্ষ করলাম, হাতির সামনে চলেছে জোব্বা ধরনের পোশাকপরা, কোমরে একটা চওড়া বেলটআঁটা, মাথায়-পাগড়িবাঁধা একটা লোক। লোকটার কাঁধে একটা বল্লম। তার প্রকান্ড গোঁফ আর গালপাট্টা। তাকে দেখিয়ে জিগ্যেস করলাম, ও কে চাচাজি?

'সাতমার'। বারুচাচাজি বললেন। ওদের সাতমার বলে। ওর নাম কী জানিস? কাল্লু পাঠান। ওকে আমি উল্লু পাঠান বলি। বারুচাচাজি হাসতে লাগলেন। লাল-বাগের পিলখানায় ওর ডেরা। লোকটা যেমন বোকা, তেমনি বদমায়েশ। ওর বিবি হল তিনটে। ছোটো-বিবির বয়স মোটে বারো।

বারুচাচাজি এত জোরে হেসে উঠলেন যে সাতমার কাল্লু পাঠান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, হুজোর?

কুছ নেহি! তুম আপ্না কদম বাঢ়াও।

বললাম, ও বাঙলায় কথা বলতে পারে না?

জবাবটা দিল কাল্লু পাঠানই। বুঝলাম তার কান তীক্ষ্ণ। সে সহাস্যে বলল, কুছু-কুছু পারে হুজোর।

ঢালু হয়ে ধাপে-ধাপে নেমে গেছে উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের বিস্তীর্ণ মাঠ। একটা সংকীর্ণ রাস্তা নেমে গেছে

নিচের দিকে। দূরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম নীল-ধূসর সেই উলুকাশের বন। একদিন যার মধ্যিখান দিয়ে আমরা মৌলাহাটে এসে পৌঁছেছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিল, বারুচাচাজিকে সেই কালোজিন-শাদাজিনের গল্পটা বলি। কিন্তু সেই মুহূর্তে উনি মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, তুমি জিগ্যেস করছ না শফি, হঠাৎ আমি কোথা থেকে এসে তোমাকে কেন আচমকা তুলে নিলাম!

ওঁর দিকে ঘোরার চেষ্টা করে বললাম, হাতির পিঠে বসে থাকতে ভালো লাগছে না! এত দুলছে!

আমাদের দুজনের প্রশ্নোত্তর সেদিন এমনি অসংলগ্ন ছিল যেন। কিংবা আমরা পরস্পর ঠিক প্রশ্নের ঠিক উত্তরই দিচ্ছিলাম—বুঝি না। বারুচাচাজি বললেন, হুঁ। তুমি কি শুনেছ তোমার বড়ো ভাই বাড়ি এসেছে?

চাচাজি, ফেরার সময় মৌলাহাট হয়ে এলে—

শফি, তোমার—মানে তোমাদের দুভাইয়ের, নুরুজ্জামান আর শফিউজ্জামানের শাদির ইন্তেজাম হয়েছে, জানো?

চাচাজি, বড়ো ভাই মুখে লম্বা-লম্বা দাড়ি রেখেছে নিশ্চয়?

শফি, হেসো না। বারু চৌধুরির কণ্ঠস্বর ক্রমশ ভরাট হয়ে উঠছিল। আমি দরিয়াবানুকে খুব বোঝালাম। ওকে তো জানো, বড্ড গোঁধরা মেয়ে। তোমার বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে রোজির আর তোমার সঙ্গে রুকুর শাদির কথা পাকা হয়ে গেছে। আগামী সাতুই অঘ্রান শুক্রবার তোমাদের শাদি।...

হাতি একটা সংকীর্ণ সোঁতা পেরুচ্ছিল। সাতমার কাল্লু পাঠান জোব্বা গুটিয়ে পায়ের নাগরাজুতো খুলে হাস্যকর ভঙ্গিতে জল পেরুচ্ছিল। ওপারে কয়েকটুকরো ধানখেতের ভেতর হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে-থাকা দুটি লোক মাথা কাত করে হাতি দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছিল। একঝাঁক বুনো হাঁস সোঁতার জল থেকে শনশন করে উড়ে ফুলন্ত কাশবনের ওপর দিয়ে ঘননীল আকাশে মিশে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কোথায় ডাকছিল একলা কোনও হট্টিটি পাখি ট্টি ট্টি ট্টি...ট্টি ট্টি ট্টি। আর আমি দেখছিলাম এইসব নানারঙের নানা ঘটনার টানাপোড়েনে গাঁথা বারু চৌধুরির 'নেচার'কে কেউ বা কিছু এক অগাধ বিষাদে আচ্ছন্ন করে আছে। কুয়াশার মতো বিস্তৃত সেই বিষাদ, হরিণমারার জমিদারবাড়ির চত্বরে শোনা বেহুলা-লখিন্দর যাত্রাপালার আসরে চারুমাসটারের বেহালার বাজনার মতো গভীর-করুণ এক সুর। ওই ধারাবাহিক ট্টি ট্টি ট্টি... ট্টি ট্টি ট্টি হট্টিট্টি পাখির ডাকে কি নীল আকাশজোড়া শূন্যতারই কণ্ঠস্বর? যেকারণে কাল্লু পাঠানের সোঁতা-পেরুনো এবং দুই আধন্যাংটো চাষার ভঙ্গিও আমাকে শেষ পর্যন্ত হাসাতে ব্যর্থ হল?

আর বারুচাচাজি কথা বলছিলেন ষড়যন্ত্রসংকুল কণ্ঠস্বরে।...এ হতে পারে না শফি! তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে মুসলমানকে। তুমি নিশ্চয় স্যার সৈয়দ আহমদের কথা পাঠ্য বইতে পড়েছ। দেওবন্দ যেখানে তৈরি করছে ছদ্মবেশী ভিখিরির দল, সেখানে আলিগড় তৈরি করছে নয়াজমানার প্রতিনিধিদের। কেন ছদ্মবেশী ভিখিরি বলছি, বুঝতে পারছিস তো শফি? তুই মৌলানাবাড়ির ছেলে। তুই বুদ্ধিমান। তোর বোঝা উচিত, এভাবে অন্যের দান হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকাটা মনুষ্যত্বের অবমাননা। নুরুজ্জামানকে আমি বুঝিয়েছি। তাকে বলেছি, এটা ইসলামের প্রকৃত পন্থা নয়। নুরুজ্জামান মহা তর্কবাগীশ হয়ে ফিরেছে। কথায়-কথায় সে কোরান-হাদিশ কোট করে। কিন্তু এটুকু বোঝে না, মুরিদ-(শিষ্য)দের ওটা ভক্তি নয়, আসলে দয়া। শফি, তোর আব্বাও এটা হয়তো টের পান। তাই তোকে ইংরেজি স্কুলে পড়তে দিয়েছেন। তোর আব্বার মধ্যে বড্ড বেশি পরস্পরবিরোধিতা। তিনিই বলেন, হিন্দুস্তান মুসলমানের 'দারুল হারাব', আবার তিনিই পয়গম্বরের কথা আওড়ান : 'উত্‌লুবুল ইল্‌মা অলাওকানা বিস্‌ সিন'! এলেম বা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন মুলুকে যেতে হলেও চলে যাও। না শফি, নুরুজ্জামানকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তোকে আমি আবিষ্কার করেছি—তোকে আমি হারাতে চাই না। তোকে আমি নিয়ে পালিয়ে যাব লালবাগ শহরে। নবাববাহাদুরকে বলে তোকে ওঁদের 'নবাববাহাদুর ইনসটিটিউশনে' ভরতি করে দেব। ওটা ওঁদের পারিবারিক স্কুল। বাইরের ছাত্রদের নেওয়া হয় না। তবু আমি ওঁকে রাজি করাব। শফি, তুই এখনও নাবালক। শাদি দিলে তোর লেখাপড়া কিছুতেই হবে না, বাবা!

কাশবনের ভেতর থেকে দুটো শামুকখোল উড়ে গিয়ে একলা-দাঁড়ানো একটা নিষ্পত্র গাছের ডালে বসলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, চাচাজি! শামুকখোল মারবেন না বন্দুকে?...

পরে বুঝতে পেরেছিলাম, দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরি কেন সেদিন আমাকে হাতির পিঠে চাপিয়ে উলুশরার জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতিবিলাসী মানুষটি প্রকৃতির ভেতরে গিয়ে আমাকে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলেন গোপনে। কারণ তিনিই জানতেন, প্রকৃতিই মানুষকে প্রকৃত গোপনীয়তা দিতে পারে।

কিন্তু রুকু—দিলরুখ, তাকে ওই ষোলোবছর বয়সেই কী দুর্দান্ত ভালোবেসে ফেলেছিলাম, তা তো বারুমিয়া জানতেন না। আমিও প্রথম-প্রথম জানতাম কি? হরিণমারার মোজাম্মেল হোসেনের বাড়িতে থেকে প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলে পড়ছি। তাঁর দহলিজঘরে আমার আস্তানা। তক্তাপোশে বিছানা পাতা। তাকে বই। দেয়ালে মক্কা-মদিনার ছবি সাঁটা। আর যে-স্বর্গীয় বাহন পয়গম্বরকে সাত আসমানের পরে আল্লার সামনে পৌঁছে দিয়েছিল, তারও একটি ছবি ছিল। বাহনটির নাম বোররাখ। তার মুখ সুন্দরী নারীর, শরীর পক্ষিরাজ ঘোড়ার। তার চুলগুলো ছিল এলিয়েপড়া। আমি তার মুখে রুকুকে দেখতাম। দিনের পর দিন দেখতে-দেখতে ওই মুখ রুকুর মুখ হয়ে উঠেছিল। আমার বুক ঠেলে আবেগ আসত। মনে হত, কেঁদে ফেলি। রুকুকে দেখার জন্য অস্থির হতাম। ছটফট করতাম। তাকে স্বপ্নে দেখতাম। দেখতাম সে আমার সঙ্গে কথা বলছে না। রাগে-দুঃখে আমার ইচ্ছে করত তাকে প্রচণ্ডভাবে মারি। আর একরাতে দেখলাম, তাকে কবরে শোয়ানো হচ্ছে। কে যেন বলছে, শফি, তুমি ওকে শেষ দেখা দেখে নাও, এবং সে কবরে শোয়ানো শাদা কাফনপরা রুকুর মুখের কাপড় সরিয়ে দিলে আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমার পাশে শুত তোফাজ্জেল সাহেবের ছেলে আমার সহপাঠী রবিউদ্দিন—রবি যার ডাকনাম। সে বলত, তোমার পেছনে জিন লেগেছে শফি। রোজ রাতে তুমি খোয়াব দেখে গোঙাও। তোমার আব্বাজানের কাছে তাবিজ নিয়ে এসো।

এই রবিই আমাকে সঠিকভাবে যৌনতা চিনিয়ে দিয়েছিল। প্রতি রাতে সে অশ্লীল সব গল্প করত। আমার গোপন অঙ্গটি দেখতে জবরদস্তি করত। ব্যর্থ হলে নিজেরটি দেখাত। সে আমাকে জঘন্যতম অনুরোধ জানাত। সাধাসাধি করত। আমি একরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে টের পেয়েছিলাম, সে আমার শরীরের একটি অঙ্গ নিয়ে কিছু করতে চাইছে। আমি তাকে ধাক্কা মেরেছিলাম। সেই প্রথম আমি কাউকে আঘাত করি শারীরিকভাবে। কিন্তু দিনে রবি ছিল অন্য ছেলে। স্কুলে হিন্দু ছেলেদেরই সংখ্যা বেশি। তাদের সঙ্গে একমাত্র তারই মাখামাখি ছিল। ক্রমশ রবির মারফত হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। আর রবিই আমাকে প্রথম বিড়ি ফুঁকতে শেখায়। স্কুলের পেছনে ছিল একটা মন্দির। মন্দিরটা ছিল ভেঙেপড়া অবস্থায়। ঘন কল্কে-ফুলের জঙ্গলের ভেতর সেই ভাঙা কালীমন্দিরের পেছনে রবি বিড়ি ফুঁকতে যেত। কয়েকটি হিন্দু ছেলেও যেত। দলবেঁধে সবাই বিড়ি টানত। বাঘ যেমন নাকি মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে মানুষখেকো হয়ে ওঠে, আমিও ক্রমশ প্রচণ্ড বিড়িখেকো হয়ে উঠেছিলাম। মাঝে-মাঝে ভয় পেয়ে ভাবতাম, আব্বার অনুগত কোনও জিন যদি এ গোপন খবর ওঁর কানে তোলে, আমার একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে।...

উলুশরার মাঠ থেকে সেদিন আমাকে বারুচাচাজি তোফাজ্জেলের বাড়ির সামনে পৌঁছে দিলে আমার খাতির বেড়ে গিয়েছিল ওবাড়িতে। কিন্তু বারুচাচাজি চলে যাওয়ার পরই আমার বুকের ভেতর একটা ঝড় বইতে লাগল। রুকুর সঙ্গে আমার শাদি হবে? এ কি সত্যি? রুকু আমার বউ হবে এবং সে আমার পাশে শোবে এবং আমি তাকে—এ কি সত্যি হতে পারে?

সে কি কাম? নাকি প্রেম? রবিকে সে-রাতে কথাটা বলামাত্র সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। জঘন্যতম সব ব্যাপার সে আমাকে হাতেনাতে শেখাতে চাইল, আর আমি আত্মসমর্পণ করলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমি চমকে উঠলাম। লজ্জায় সংকোচে কাঠ হয়ে গেলাম। রুকুর সঙ্গে আমি এসব অশালীন কিছু করব ভাবতেই খারাপ লাগল। মনে-মনে মিনতি করে বললাম, রুকু! তুমি মায়ের কাছে শোনা সেই আকাশচারিণী পরি, বাড়ির পেছনে তালগাছে যে মধ্যরাতের জ্যোৎস্নায় বিশ্রাম নিতে বসত আর খড়খড় সরসর শব্দে তালের বাগড়াগুলো নড়ত। রুকু সেই পরি, যার বাসস্থান আকাশের দ্বিতীয়

স্তরের পরিস্তানে, যেখানে ফুটে আছে লক্ষকোটি নক্ষত্র দিয়ে গড়া প্রলম্বিত ছায়াপথ।...

খানবাহাদুর দবিরউদ্দিন চলে যেতেই আমি যে খোলামেলা পৃথিবীকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেলাম, সেখানে মানুষের গলায় ফাঁসির দাঁড় পরানো নিষ্ফল। দবিরউদ্দিন আমাকে কলকাতার উচ্চ আদালতে আপিলের খবর এনেছিলেন। আমি তাঁকে মনে-মনে গাল দিয়ে বললাম, শুওরের বাচ্চা! ইংরেজশাহির পা-চাটা গোলাম কুত্তা! আমাকে কেউ ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারে না, তুমি জানো না?

এই যে অবাধ দুনিয়ার হাট করে খোলা দরজা দিয়ে আমি ছুটে চলেছি, আমার ষোলো বছর বয়সের শরীরটাকে ফিরে পেয়েছি, আমার এই স্বাধীনতা প্রকৃতি থেকে আমার বুকের ভেতর ঢোকানো হয়েছিল। খানবাহাদুর, তুমি মাথামোটা এক খয়েরখাঁ। তুমি যে এত ধর্ম-ধর্ম করো, সব তোমার শেখা বুলি। পয়গম্বরের ছেলেবেলার একটি গল্প বলতেন আব্বা। বালক পয়গম্বর যখন রাখাল ছিলেন, হঠাৎ সেই উপত্যকায় নেমে এল দুই ফেরেশতা। তাঁকে ধরে ফেলল তারা। চিত করে শোয়াল। তারপর তাঁর বুক চিরে ফেলে তাঁর কলজে থেকে অসৎ টুকরোটি কেটে নিয়ে সৎ এবং স্বর্গীয় একটি টুকরো জুড়ে দিল। এ একটি শল্যচিকিৎসা। ফেরেশতারা উধাও হয়ে গেলে সপ্তমী রাখাল বালকেরা আতঙ্কিত হয়ে খবর দিল পয়গম্বরের ধাইমা বিবি হালিমার কাছে। বিবি হালিমা ছুটে এসে দেখলেন, বালকটি শুয়ে আছে। কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই তার বুকে। আর এই ঘটনার নাম 'সিনা-চাক্' বা বক্ষবিদারণ। দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরির একটি বিশাল কালো জানোয়ারের পিঠে চাপিয়ে উলুশরার তৃণভূমিতে আমাকে নিয়ে যেন এমন কিছুই করেছিলেন এবং আমার কলজে আমারই অজান্তে বদলে গিয়েছিল। আমার 'সিনা-চাক্' বুঝতে আরও তিরিশ বছর লেগে গিয়েছিল। আমি বুঝতেই পারি নি আমি কী হয়ে গেছি সেদিন থেকে। অথচ রবিউদ্দিনের সঙ্গে রাতভর দিনভর খালি রুকুর কথা বলেছিলাম। কালীমন্দিরের পেছনের কল্কেফুলের জঙ্গলে বিড়ি টানতে-টানতে বলেছিলাম, রুকুর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে আমি ওসব কিছু করতে পারব না, রবি! আর রবি খি-খি করে হেসে বলেছিল, তোর আব্বাজান তো পির-মৌলানা মানুষ। একজোড়া জিন-পরি পাঠিয়ে দেবেন তোকে হাতে-কলমে শেখাতে। তোর আবার ভাবনা?

হরিণমারার মুসলিমরা ছিল হানাফি সম্প্রদায়। তারা কেউ-কেউ আব্বাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। রবিও করত। কিন্তু তার বাবা খোন্দকার হাসমত আলি ছিলেন আব্বার অনুরাগী মানুষ। লম্বাটে চেহারার এই মানুষটির চিবুকে ছিল ছাগলদাড়ি। মাথায় সব সময় তুর্কি ফেজটুপি পরে থাকতেন। লাল কোটো-গড়নের টুপিটার শীর্ষে ছিল কালো মাদুলির মতো দেখতে একটুকরো গালা আর তা থেকে ঝুলত রেশমি কালো একগুচ্ছ সুতোর ঝালর। বিনীত, মৃদুভাষী এই লোকটি প্রথম দিন থেকেই আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁর বংশ-পদবি ছিল খোন্দকার। তিনি ছিলেন উচ্চবর্ণীয় আশরাফ, যাঁদের মিয়াঁ বলাই মুসলিমদের মধ্যে রেওয়াজ। হিন্দুরা অজ্ঞতাবশে মুসলিমমাত্রেই মিয়াঁ বলেন দেখেছি। বারচাচাজি বলতেন, মিয়াঁ বা মিঞা কথাটা ফারসি। এর মানে হল মধ্য। সমাজের মাঝখানে যারা আছে। কিন্তু জেনো শফি, এই মাঝখানে-থাকা লোকগুলোর মতো বদমাইশ দুনিয়ায় আর থাকতে নেই। এরা গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। এই যে 'খোন্দকার'-সায়েবকে দেখছ, আমার কথা মানেন-গোনেন, ভয়-ভক্তি করে চলেন, তার কারণ কী জানো? উলুশরার নাবাল মাঠে নবাববাহাদুর যে ঘের (বাঁধ) তৈরির আরজি মনজুর করেছেন, তার মূলে আমি। আর খোন্কার আছেন তদ্বিরে, চাষাভুষো গরিব-গুরোবোর ইন্তফা-দেওয়া ভুঁইখেত সামান্য সেলামিতে যাতে পেয়ে যান। ঘের হলে উলুশরার মাঠে ফসল ফলবে। নবাবের খাজাঞ্চিখানা উঠবে ভরে।

জমিজমা ভুঁই-খেত এসব আমি তখনও বুঝতাম না। আব্বা গর্ব করে বলতেন, মাটি নিয়ে দুনিয়াদারি আমাদের নয়। খোদাতালার দুনিয়ায় সব ছেড়ে শুধু মাটি মেপে বেড়ায় যারা, তারা গোনাহ্গার—পাপী। সেই পাপেই মুসলমানের বাদশাহি বরবাদ হয়েছে। খোনকারসায়েব তাঁর ছাগলদাড়ি মুঠোয় চেপে যখন ছড়ি-হাতে মাঠের জমির আলে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমার মনে হত, আব্বা যদি এখন ওঁকে দেখতেন, কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতেন।...

বারচাচাজি আমার কানে ফুসমন্তর দিয়ে চলে যাওয়ার কদিন পরেই দুখু নামে একটি লোক এল মৌলাহাট থেকে। শীর্ণকায় এই খেতমজুরটি ছিল ভারি আমুদে। সে মুচকি হেসে যখন বলল, হুজুর তলব দিয়েছেন, তখনই আমি সতর্ক হলাম। আমার চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। আস্তে বললাম, কদিন পরেই স্কুলে পুজোর ছুটি পড়বে। তখন যাব।

দুখু চোখ নাচিয়ে বলল, সে যখন যাবেন, তখন যাবেন। হুজুর বলেছেন, আপনার আম্মাজানও বলেছেন —পইপই করে বলেছেন, একবেলার জন্য যেতেই হবে। আমাকে ধরে আনতে হুকুম জারি হয়েছে, বাপজি!

শরৎকালের বিকেলে বাদশাহি সড়কের ধারে ক্লাস সিক্সের কজন বন্ধু মিলে আমরা রোজ গিয়ে বসে থাকতাম। রবি, কালীচরণ, বিনোদ আর পোদো। পোদোর আসল নাম ছিল হরেন। কালোরঙের মারকুটে চেহারার পোদো দুখুকে চোখ পাকিয়ে বলল, শফির বাবাকে গিয়ে বলো, শফি বিয়ে করবে না। শালা! গুয়োর ডিম ভাঙে নি, এখনই মেয়েমানুষের পাশে শোবে!

শোনামাত্র আমি চমকে উঠলাম। রবি তাহলে কথাটা রটিয়ে দিয়েছে! তখন স্কুলেপড়া ছাত্রদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এমন কী, বিনোদেরও বিয়ে হয়েছে। সে ময়রাবাড়ির ছেলে। বয়সে সবার বড়ো। সে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। দুখুও খিক-খিক করে বেজায় হাসল। বলল, বাবুমশাই, তা বললে কি চলে? গাঁ জুড়ে রোয়াব উঠেছে, পিরসাহেবের ছেলেদের বিহা।

পোদো আমার গোপন অঙ্গে খামচে ধরে বলল, কী রে? বিয়ে করবি? ছিঁড়ে ফেলব—বল্, করবি?

আমি জোরে মাথা নেড়ে, কিন্তু মুখ নামিয়ে বললাম, না।

দুখু বেগতিক দেখে গোমড়ামুখে বলল, সেটা পরের কথা। হুজুর যখন ডেকেছেন, তখন একবার চলুন। মাজান বড়ো কাঁদেন আপনার জন্য। আর আয়মনি— আয়মনিও কেঁদে 'বিয়াকুল'। বলে, আহা, চোখের ছামু থেকে ছেলেটা দূর হয়ে গেল গো!

হঠাৎ আমার মনে হল, রুকু কি কিছু বলে না? কোনো কথা বলে না কারুর কাছে? সড়কের দুধারে অপার সবুজ ধানখেত। সাঁকোর ধারে আমরা বসে ছিলাম। নিচে স্বচ্ছ জলেভরা কাঁদর। দিনের শেষ আলোয় সবকিছুর ভেতর রুকুকে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। উত্তরদেশের গাড়োয়ানদের যে দলটি সার বেঁধে গোরুর গাড়ি নিয়ে একটু আগে সাঁকো পেরিয়ে গেছে, তাদের একজনের গান তখনও ভেসে আসছিল দূর থেকে। হরিণমারার জমিদারবাড়ির সিংহবাহিনীর মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজতে থাকল। মুসলিমপাড়ার প্রাচীন নবাবি মসজিদের শীর্ষ থেকে 'মোয়াজ্জিনে'র আজানধ্বনি ভেসে এল। আর দুখু শেখ ব্যস্ত হয়ে কাঁদরের জলে আজু করে নমাজে দাঁড়াল। তার বিস্মিত আর বিচলিত চাউনি দেখে বুঝতে পারছিলাম, পিরসাহেবের ছেলেকে তার পাশে নমাজে আশা করেছিল। কিন্তু শেষে হতাশ হয়ে নমাজ পড়তে থাকল। রবি চাপা গলায় রুকু আর আমার সম্পর্কে অশালীন কথা বলতে থাকল বন্ধুদের সঙ্গে। সে কি নিছক কাম? সে কি প্রেম? আমার চারপাশ থেকে প্রতিবিম্বিত রুকু হাতছানি দিল। তার মেয়েলি চুলের গন্ধ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার, যে গন্ধ সে কাছে এসে দাঁড়ালেই ঝাঁঝাল হয়ে নাকে ঢুকেছে এবং কী এক প্রক্ষোভে জর্জরিত হয়েছে আমার আমূল অস্তিত্ব। দুখু নমাজ শেষ করে টুপিটি ভাঁজ করে ফতুয়ার পকেটে গুঁজে আমার কাছে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। রবি বলল, রাত্তিরটা থাকিস। কালীচরণ আর বিনোদ খা-খা করে হাসতে থাকল। শুধু পোদো বলল, মরবি শফি, মারা পড়বি।...

মৌলাহাটে পৌঁছেই দুখু আমাকে প্রথমে মসজিদে আব্বার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন 'এশা'র নমাজ চলেছে। নমাজের প্রতি ততদিনে আমার গরজ কমে গেছে। দুখু মসজিদে ঢুকে চত্বরের চৌবাচ্চায় অজু করতে ব্যস্ত হলে আমি সেই সুযোগে কেটে পড়লাম। সোজা বাড়ি গিয়ে ঢুকলাম। ডাকলাম, মা! তারপরই শুধরে নিয়ে ডাকলাম, আম্মা!

দেখলাম, মা বারান্দায় সবে নমাজ শেষ করে 'মোনাজাত'—করজোড়ে প্রার্থনা করছেন। একটু একটা লম্প জ্বলছে। রান্নাঘরের বারান্দাতেও একটি লম্পের সামনে বসে মেজোভাই মনি দুলছে আর আঙুল চুষছে। তার মুখের দুপাশ লালায় ভেসে যাচ্ছে। তার গালে দাড়ি গজিয়ে গেছে। সে আমাকে দেখে অদ্ভুত গোঙানো গলায় যখন বলে উঠল, ছফি! তখনই আমার চমক লাগল। আব্বার অনুরক্ত জিনেরা কি তাহলে একদিন মনিভাইয়ের ভেতরকার কালো জিনটিকে তাড়াতে পেরেছে?

ঘরের ভেতর থেকে দাদি-আম্মার সাড়া পেলাম, কে রে? নুরু?

না দাদি-আম্মা! আমি।

শফি! পক্ষাঘাতগ্রস্তা বৃদ্ধা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। খুশি ফেটে পড়ছিল তাঁর কণ্ঠস্বরে। ঘরে ঢুকে তাঁর 'কদমবুসি'—পদচুম্বন করামাত্র তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন। হেসে-কেঁদে বৃদ্ধা অস্থির। তারপরই দেখতে পেলাম দরজার সামনে দাঁড়ানো এক ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তিই। মাকে চিনতে পারছিলাম না। সে যেন মায়েরই বিকৃত এক প্রতিরূপ। কোটরগত চোখ, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, বসা গলা, সরু নাকটিও নেতিয়ে গেছে। পরনে যেমন-তেমন একটা শাড়ি। উঠে এসে কদমবুসি করলে বুকে চেপে ধরলেন। বুকের স্পন্দন অনুভব করলাম। সেই মুহূর্তে দাদি-আম্মা সহাস্যে বলে উঠলেন, তোমার ব্যাটার মুখে বদ্‌বু (দুর্গন্ধ) নিকলাচ্ছে, বউবিবি! ওকে পছ্ছ করে দ্যাখো, বিড়ি-তামুক খেতে শিখেছে ইস্কুলে!

দাদি-আম্মা খুব হাসতে থাকলেন। মা কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। দেখলাম, ঘরখানিতে অনেক বদল ঘটেছে। তক্তায় রাখা আব্বার আরবি-ফারসি কেতাবের স্তূপটি নেই। সেখানে নতুন কিছু তোরঙ্গ আর বেতের পেটরা রয়েছে। তক্তাপোশের বিছানাটি নতুন বলে মনে হল। আলনায় কিছু নতুন শাড়ি ঝুলছে। মা আমাকে নিয়ে বিছানায় বসলেন। তাঁর চোখে জল ছিল। মুছে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, তুই-ও আমাকে ভুলে গেলি, বাছা?

মনে-মনে বললাম, ভুলি নি আম্মা! মুখে বললাম, স্কুলে খুব পড়ার চাপ।

মা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, নুরু এসেছে খবর পেয়েছিস?

হুঁ। বারি-চাচাজি বলছিলেন।

নুরু 'ফাজিল' হয়েছে। মায়ের মুখে ঈষৎ গর্বের রেখা ফুটে উঠল কথাটা বলতে।

'ফাজিল' ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি। কিন্তু আমি তাচ্ছিল্য করে বললাম, বড়োভাই এবার খুব ফাজলেমি করে বেড়াবে দেখবেন!

মা ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ছিঃ! বড়োভাই সম্পর্কে আদব-লেহাজ করে কথা বলতে হয়।

বড়োভাই বুঝি মসজিদে?

মা মাথা নাড়লেন। তারপর একটু হেসে বললেন, তোদের দু-ভাইয়ের শাদির ইন্তেজাম হয়েছে। দরিয়া-বানুরই জেদ। তোর আব্বাসাহেবও মত দিয়েছেন।

মায়ের একটা চোখ ছিল রান্নাঘরের বারান্দার দিকে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। দেখলাম, মনিভাই লম্পটার দিকে ঝুঁকে ফুঁ দিচ্ছে। মা 'অই! অই!' বলে তার হাত থেকে লম্প কেড়ে নিলেন। তারপর ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম, মনিভাইয়ের কাঁধ ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসছেন। মনিভাই টলমলো পা ফেলে হেঁটে আসছে। এঘরে ঢুকেই সে মেঝেয় বসে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে লাগল। মা আমার পাশে বসে একটু হেসে বললেন, মনির আমার খানিক-খানিক হুঁশবুদ্ধি ফিরেছে।

বলে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে বললেন ফের, খবর্দার বাবা, তোর আব্বা যেন জানতে না পারেন। দরিয়া-আপার কথায় খোঁড়াপিরের মাজারে গিয়ে সিন্নি চড়িয়েছিলাম। অমনি মনি আমার—

মা! আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

মা বললেন, চুপ। চুপ। দেওয়ালের কান আছে।

আমরা ফরাজি না?

মায়ের মুখে একটা কালো ছাপ পড়ল। ঠোঁট বেঁকে গেল। হিশ-হিশ করে বললেন, এতকাল দুনিয়া জুড়ে পিরদের সঙ্গে জেহাদ করে এবার নিজেই পির সেজে বসেছেন! মসজিদে রাতের বেলা জিনপরি এসে খিদমত (সেবা) করছে। তাই হুজুরের আর বাড়ি আসা হয় না। ফরাজি! আহলে হাদিস! লা-মজহারি! মোহাম্মদি! তারপর কি না ওহাবি! মুখে কতরকম বুলি। এদিকে—

হঠাৎ মা আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলেন। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। একটু পরে বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন আম্মা?

মা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আয়। ইঁদারার পানি তুলে দিই। হাত-পা ধো।

মা বেরিয়ে গেলেন, তখনও আমি বসে আছি। কিছু বুঝতে পারছি না। তারপর মনিভাইয়ের দিকে চোখ পড়ল। সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখে কেমন

একটা হাসি। তারপর সে দুইহাতের আঙুল দিয়ে মিথুন-সংকেত দেখাতে লাগল। এই সংকেতটি খয়রা-জোলের স্কুলে পড়ার সময় আবু নামে এক সহপাঠীর কাছে প্রথম দেখি। মনিভাইয়ের এমন কাণ্ড দেখে লজ্জায়-রাগে-ঘেন্নায় দ্রুত বেরিয়ে গেলাম।

উঠোনের জীর্ণ ইঁদারাটি মেরামত হয়েছে। লম্পের সামান্য আলোয় বাড়িটা নতুন দেখাচ্ছিল। মা নিজেই আমার হাত-পা ধুয়ে দিলেন। দিতে-দিতে বললেন, দেখছিস কত গাঁদাফুলের ঝাড় হয়েছে। সব আয়মনির কাণ্ড। একটু আগে খবর নিতে এসেছিল শফি এল নাকি। সবচেয়ে ওর খুশিটাই বেশি, জানিস? বলে কী, পিরসাহেব তো মসজিদে। আমরা ঢোলক বাজাব শাদিতে। নাচব। গাঁত গাইব। সং দেব। পিরসাহেব শোনে তো শুনুক। ফরাজি হয়েছি তো কী হয়েছে? 'পুরুষান' (পুরুষানক্রমে) যা হয়ে এসেছে মৌলাহাটে, তা না হলে চলে?

মা অনর্গল এসব কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি শুনতে চাইছিলাম রুকুর কথা। রুকু কী বলছে? রুকু কি আগের মতো আসছে আমাদের বাড়িতে? রুকু কি খুশি হয়েছে?

মা ওসব কথা কিছুই বললেন না। আঁচল দিয়ে আমার পা, হাত, মুখ মুছিয়ে কাঁধ ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর বাইরে কেউ গম্ভীর গলায় বলে উঠল, আম্মাজি! স্বরটা চেনা মনে হল। কিন্তু আব্বার চেয়ে গম্ভীর আর প্রতিধ্বনিময় সেই কণ্ঠস্বর। আবার সে বলল, শফি এসেছে শুনলাম। কই সে? তারপর দরজায় একজনকে দেখতে পেলাম। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

ঝকমকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে কালো দাড়ি। মাথায় ফেজ টুপি। পরনে ঘিয়ে রঙের আচকান। পায়ে নাগরা জুতো। এই কি আমার বড়োভাই নুরুজ্জামান? মা আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন, বড়োভাইয়ের সঙ্গে আদব-লেহাজ করতে হয় জানো না? ছিঃ!

আমি ওঠার আগেই নুরুভাই এসে আমাকে আলিঙ্গন করল। বলল, তু কিতনা বাঢ় গিয়া, শফি? তুমকো হাম পছানতাভি নেহি!

মা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, ওই জবানে বাতচিত আর করিস না বাবা! ওই খোট্টামি শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।

নুরুভাই হাসতে-হাসতে বলল, মুসলমানের জবান, আম্মাজান! তারপর আমার পাশে বসে বলল, তুই নাকি ইংরেজি ইস্কুলে পড়ছিস? আব্বাজানকে বললাম, ইয়ে ক্যা কিয়া আপনে? আব্বাজানের বাত সমঝ করা গেল না। কে এক নবাববাহাদুরের দেওয়ানসাব নাকি তেনাকে কীসব সমঝেছেন, আব্বাজান তাঁর ফাঁদে পড়ে—তো শফি, তোর চেহারায় হিঁদুর ছাপ পড়েছে। তুই কি ইস্কুলে ধোতি-উতি পিঁধিস, নাকি পায়জামা-কুর্তা পিঁধিস?

আস্তে বললাম, হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরে স্কুলে যেতে হয়।

নাউজুবিল্লাহ্! নুরুভাই বলল। অবশ্য সে হাসছিল। তোকে আব্বাজান—

না। বারিচাচাজি কিনে দিয়েছেন।

উও কৌন? কে সে?

মা বললেন, সেই তো দেওয়ানসাহেব। দরিয়া-আপা—মানে তোদের হবু-শাশুড়ির দেওর হন তিনি। হাতিতে চেপে মহালে-মহালে ঘোরেন। ওনাকে তুই চিনিস নে, নুরু! উনি ইংরেজিপাস পণ্ডিত। হিঁদুরাও ওনার কত কদর করে জানিস?

নুরুভাই একটু গম্ভীর হয়ে বলল তো ঠিক হ্যায়। নসিব আপনা-আপনা। আম্মাজান, ভুখ লেগেছে। জলদি খানা নিকালেন। অনেক বছর পরে দুভাই পাশাপাশি বসে খাই। দেওবন্দের মেহমানখানার (অতিথিশালা) খেয়ে মু খারাব হয়ে গিয়েছে। শফি, তুই নাকি কার বাড়ি 'জায়গির' আছিস?

মা বলে গেলেন, খোনকারসাহেবের বাড়ি। খবর নিয়েছি, ওনারা শরিফ ঘর।

নুরুভাই ঘোষণা করল, আল্লার দুনিয়ায় শরিফ-নিচ, আশরাফ-আজলাফ কিছু নাই। সবাই আল্লাহতায়লার বান্দা। দুনিয়ার কোথাও ইসলামে এ জিনিস নাই। খালি হিন্দুস্তানের মুসলমান হিঁদুদের দেখে জাত-বেজাত শিখেছে। মুসলমান 'কুফরি কালাম' (নাস্তিকামূলক বিদ্যা) পেয়েছে হিন্দুস্তানে এসে। সব মানুষ সমান। আমরা সবাই বনি-আদম (আদমবংশধর)।

নুরুভাইয়ের এই কথাটাই এতক্ষণে ভালো লাগল।...

বারিচাচাজি বলতেন, 'ইসলাম ইজ দ্য ড্রাসটিক ফরম অব ক্রিসটিয়ানিটি' বলে একটা কথা চালু আছে, জানিস

শফি? তো তোর বড়োভাই মৌলানা নূরুজ্জামান ইজ দা ড্রাসটিক ফরম অব ইওর ফাদার মৌলানা বদি-উজ্জামান! পিতৃনিন্দা শুনে রাগ করলি না তো? নিন্দাছলে স্তুতি। অলঙ্কারশাস্ত্রে একে বলে ব্যাজস্তুতি। তোর পড়ার বইতে নেই ভারতচন্দ্রের সেই কবিতাটা শিবের ব্যাজস্তুতি?

হরিণমারা স্কুলে গিয়ে একটা বিপত্তি ঘটেছিল। ঘটিয়েছিলেন বারুচাচাজিই। আব্বাকে জানতে দেন নি, আরবি-ফারসির বদলে সংস্কৃত নিয়েছিলাম আমি। তাঁরই কথায়। তাঁর কথায় সায় দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না আমার। আমাকে তিনি বশ করে ফেলেছিলেন। তবে খোনকারসাহেবের ছেলে রবিকেও সংস্কৃত নিতে হয়েছিল। কারণ প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলে গোড়ার দিকে আরবি-ফারসি শিক্ষক নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে নি। মুসলিম ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম। আমার ভরতি হওয়ার বছর নবাববাহাদুরের অর্থসাহায্যে সেক্রেটারি হিন্দু জমিদার রায়সাহেব প্রথম মৌলবিশিক্ষক রাখেন। তাঁর নাম ছিল জসিমুদ্দিন। তাঁকে ছাত্ররা বলত, যাশু মৌলবি। কেপ্পনের যাশু এই মৌলবি সম্পর্কে নানান গুজব ছড়াত ছাত্ররা। আমাকে আর রবিকে দুচোখে দেখতে পারতেন না তিনি। তবে পোদোকে বড্ড ভয় করতেন। তারই ভয়েই হয়তো আব্বার কানে আমার সংস্কৃত পড়ার কথাটা তুলতে যান নি।...

লম্বানেকো শান্তীটি গরাদের ভেতর দিয়ে কুতকুতে চোখে ডাকল, সাব!

মুহূর্তে দেখলাম আমার চারদিকে কালো দেয়াল এগিয়ে এসে ঘিরল। মুখ তুলে দেখলাম, উঁচুতে একটা ছাদ। কোনায় মিটমিটে বিজলিবাতি জ্বলছে।

কুছ তকলিফ হ্যায়, সাব?

না তো ভাই!

সে সরে গেল। তার বুটের শব্দ থামলে আমি আবার সামনে দেয়ালের দিকে তাকালাম। দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সাতমাত কাল্লু পাঠান। তার গলার কাছে টাটকা ক্ষত। গলগল করে রক্ত পড়ছে। বুক ভেসে যাচ্ছে। কাটা শ্বাসনলী দিয়ে লাল বুজকুড়ি ফুটে উঠছে। সে বলল, শফিসাব! আর বুজকুড়িগুড়ো ফাটতে থাকল। ঘড়ঘড় শব্দ।

বলো কাল্লু!

সিতারা—সিতারা হামাকে বলল কী—

কাল্লু পাঠানের বুকে দুমদাম ঘুসি মারতে থাকলাম। আমার হাতে রক্ত লাগল।

লম্বানেকো শান্তীটি ব্যস্তভাবে ডাকছে শুনতে পেলাম, সাব! সাব!

ঘরে দেখে স্থির দাঁড়িয়ে গেলাম। আস্তে বললাম, ও কিছু না।...

কোথাও ঢং-ঢং শব্দে ঘন্টা বাজল। গোনার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম ঘন্টাধ্বনি দূরে অপ্রিয়মাণ, আর তা ক্ষণীতম হতে-হতে ভীষণ-গম্ভীর অন্ধকার চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। মাথা তুলে দেখি, কালো আকাশ জুড়ে এরাতে বড়ো বেশি নক্ষত্রের ঝাঁক। আর স্তব্ধতা। বড়ো বেশি সেই স্তব্ধতা, যা গাছপালা থেকে শিশিরের ফোঁটা ঝরে পড়ার টুপটাপ ধ্বনিপুঞ্জকেও করতলগত করে। আর হঠাৎ যদি দূরে হেঁকে ওঠে রৌদের চৌকিদার, তারপর ভেসে আসে কোনও হকচকিয়ে ওঠা কুকুরের ডাক, তবুও এ শরৎকালীন মধ্যরাতের ওই স্তব্ধতা সেগুলোকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বারুচাচাজি বলতেন, প্রকৃতি সর্বগ্রাসী।...

আলোর বিন্দুটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। যত স্পষ্ট হচ্ছিল, তত আমার কাঁধে কারুর হাতের ছোঁয়া টের পাচ্ছিলাম। চমকে উঠে আবিষ্কার করলাম নূরুভাইকে। আমি তার সঙ্গে মসজিদের দিকেই চলেছি। বারান্দার থামের ফাঁক দিয়ে সুদৃশ্য চীনা লণ্ঠনটি দেখা যাচ্ছে। চত্বরে ঢুকে নূরুভাই একটু কেশে সাড়া দিল। তারপর চত্বরকেন্দ্রের চৌবাচ্চার কাছ থেকে সাড়া এল, নূরুজ্জামান!

জি।

শফি এসেছে?

জি হাঁ।

অন্ধকারে উঁচু বিরাট ছায়ামূর্তির কাছে গিয়ে পদচুম্বন করলাম। আর সেই বুঝি ছিল এক আশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় রাত, যে-রাতে সেই প্রথম ও শেষবার আমার পিতা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

মসজিদের বারান্দার নিচে জুতো খুলে রেখে আমরা দুভাই তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি খালি পায়ে ছিলেন। ভেতরে লণ্ঠনের আলোয় একটি নকশাদার কাশ্মীরি গালিচা দেখলাম। গালিচাটির পরিপ্রেক্ষিতে ছিল লাল। সেটি পুরু ও নরম। আব্বা পা-মুড়ে বসে আস্তে বললেন, বসো। একটু দূরত্ব রেখে বসতে যাচ্ছিলাম। আব্বা বললেন, এখানে বসো। আমরা দু-ভাই গালিচার ওপর বসলাম। তখন আব্বা চোখ বুজলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি তসবিহ্‌দানা (জপমালা)। চোখ বুজে থেকে তিনি বললেন, তোমাদের দু-ভাইয়ের শাদির ইন্তেজাম করেছি।

নূরুভাই আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আস্তে বলল, জি! তার এই 'জি' শব্দে সম্মতি ছিল।

আব্বা আমাকে ডাকলেন, শফিউজ্জামান!

জি? আমার এই 'জি' শব্দে প্রশ্ন ছিল।

আব্বা চোখ না খুলেই বললেন, দেওয়ানসাহেব তোমার শাদিতে নারাজ। দরিয়াবিবির সঙ্গে তাঁর এজন্য কাজিয়া হয়েছে, শুনেছি। দেওয়ানসাহেব নাকি বলে গেছেন, শফিউজ্জামানের সঙ্গে বেটির শাদি দিলে উনি আর এবাড়ি কখনও আসবেন না।

নূরুভাই কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু বলল না। তার মুখে বাঁকা কিছু রেখা ফুটে উঠল।

আব্বা বললেন, ইসলাম বলেছে ছেলে-মেয়ের শাদি দেওয়া বাবা-মায়ের পক্ষে ফরজ (অবশ্য পালনীয়)।

কথাটা বলে আব্বা চোখ খুললেন। আমার দিকে তাকালেন। নূরুভাই তাকাল আমার দিকে। লণ্ঠনের আলোয় তিনটি মুখ পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ। বাইরে দূরে রৌদের চৌকিদার ডাকল একবার। হেই—ই—ই! জা—আ—গো—ওঃ! তারপর আব্বা ডাকলেন, শফিউজ্জামান!

আমি ফের বললাম, জি! এই শব্দটি এবার ছিল নিরর্থক একটি শব্দমাত্র। যেমন শিশির-পড়ার কিংবা যে-কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির মতোই, যার এমন কঠিন নিজস্বতা আছে যে মানুষ তাকে উপমায় বা প্রতীকে বা কোনোভাবেই চৈতন্য সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় পরিণত করতে পারে না। সেটি একটি জড় ধ্বনিমাত্র। জলে ঢিল ছুড়লে যে শব্দ ওঠে, তাকে তুমি—হে লম্বানেকো শান্তী, জলের আর্তনাদ বলে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারো। কিন্তু আমার ওই জি-শব্দটির তেমন কোনো আরোপিত ব্যাখ্যাও চলে না।

অথচ মানুষের মূঢ়তা এমনই অবিমৃষ্যকারী, এমনই অসহায়তা তার অস্তিত্বের এক মৌল উপাদান—যা সে মাতৃগর্ভ থেকে সঙ্গে নিয়ে জন্মায় যে, সে সবকিছুকেই চৈতন্যময় ভাবে। আজ আমি অনিবার্য মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি বলেই নয়, এ তো একটা নিজস্ব-সাধিত পরিণতি আমারই অস্তিত্বের, ক্রমশ জেনেছিলাম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জড়প্রক্রিয়ারই এক হঠকারী পরিণাম জীবন নামক একটা ঘটনা—নিছক ঘটনামাত্র!

এই দেখো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চল্লিশ বছর আগের এক শরৎকালীন মধ্যরাতে মৌলাহাট গ্রামের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন মসজিদের ভেতর লণ্ঠনের আলোয় কাশ্মীরি গালিচায় বসে, পরবর্তী কালে বদ্রুপির নামে যিনি প্রখ্যাত হন এবং যাঁর মাজার শরিফ পর্যন্ত গড়ে ওঠে, অথচ যিনি একদা ছিলেন পিরতন্ত্রবিরোধী কট্টর ফরাজি মৌলানা, তাঁর 'শফিউজ্জামান' সম্ভাষণে প্রশ্ন ছিল!! প্রশ্ন ছিল শাদিতে আমার সম্মতি আছে কিনা! ভাবা যায় না হে লম্বানেকো শান্তীভাই, তা তোমার কাঁধে বন্দুকই থাক কিংবা কোমরে ঝুলুক খাপোচকা বেয়নেট!

কিন্তু আমার 'জি' শব্দটিকে তিনি, তাঁর মতো বিচক্ষণ জ্ঞানী পুরুষ, একই সাধারণ মূঢ়তায় সম্মতি বলে ধরে নিলেন, যদিও আমি হ্যাঁ বা না কিছু বলতে চাই নি। কারণ তখন আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন। বারুচাচাজি এবং রুকু। আমি ভাবছিলাম কার দিকে যাব—কে আমার প্রিয়?...

খুব সকালে আমার ঘুম ভাঙল আয়মনি। তার চেহারার ঝলমলানি দেখে তো আমি অবাক! সে গাভরা রুপোর গয়না পরেছে। রঙিন ডুরে শাড়ি, এমন কী কুর্তাও পরেছে—যত বেঢপ দেখাক, আর তার কপালে কাঁচপোকার টিপ। তার সারা দেহ ঝিকমিক করছিল হাসিতে। শফি এসেছ? মানিকসোনা এসেছ? বলতে-বলতে সে আমার হাত ধরে টেনে ওঠাল বিছানা থেকে। সে আমার শাদিতে কত খুশি বোঝানোর জন্য চাপা গলায় একরাশ কথা বলতে থাকল। আমি চুপ করে থাকলাম। অথচ আমার জানতে ইচ্ছে করছিল বুকুর কথা। মুখ ফুটে জিগ্যেস করতে পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আয়মনি নিজে থেকেই জানিয়ে দিল, দুই-বোন এখন পরদাবন্দি। বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ। তারা যে শাদির দুলহান এখন। তাছাড়া গ্রামে কড়া পরদা চলেছে আউরতদের। সবাই ফরাজি হয়ে গেছে

কিনা! আর—আয়মনি উপসংহারে বলল, এখন দরি-বিবির বাড়িমুখো হতে নেই তোমার। তুমি যে শাদির নওশা। ওবাড়ির জামাই হবে!

হঠাৎ একটা জোরালো অভিমান আমার বুকের ভেতর চেপে বসল। সেই অভিমান সূর্য ওঠার পর আমাকে বলিয়ে দিল, আম্মা, আমি চললাম। স্কুল কামাই করলে নাম কেটে দেবে। আর আমাকে বেরিয়ে যেতে দেখে মা আর্তনাদের সুরে ডাকলেন, শফি! শফি! আমি পিছু ফিরলাম না।...

[ক্রমশ

লেভ তলস্তোয়ের জীবন, সাধনা, রচনা

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইংরেজিতে যাঁর নাম লিও টলস্টয়, রুশ ভাষায় তাঁর নাম লেভ্ তলস্তোয়। রুশী উচ্চারণ লিয়েভ্ তলস্তোয়। তাঁর জন্ম ১৮২৮ সালে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালে বিশ্ব জুড়ে। সেই উপলক্ষে অকসফোর্ড ইউনি-ভারসিটি প্রেস থেকে তাঁর বহু গ্রন্থ তথা বহুপ্রকার গ্রন্থ সুলভে প্রকাশিত হয়। তার অর্ধশতক পরে ১৯৭৮ সালে তাঁর সার্ধ-জন্মশতাব্দী। কিন্তু এবার তেমন বিশ্ব জুড়ে নয়। কলকাতায়ও একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। কিন্তু তার তেমন কোনো স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি বা আমার নজরে পড়ে নি॥ আমিও একটি প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করে-ছিলুম। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই বৃহদায়তন গ্রন্থ দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। কলকাতা যা পারে নি ঢাকা তা পেরেছে। এটি একটি মনে রাখবার মতো বই। শুধু স্মারক নয়, স্মরণীয় গ্রন্থ। 'নিবেদন' লিখেছেন কবীর চৌধুরী।

এর উপাদান হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত দুটি সেমিনারে পঠিত তথা পঠিতব্য রচনা, তার সঙ্গে রাজ-শাহীতে যে সেমিনার হতে পারল না সেই অনুষ্ঠানে পঠিতব্য কয়েকটি রচনা। আলোচনার ভিত্তিতে পরে লিখিত। একজন রুশ যোগদাতা বাদে আর চৌদ্দজন বাংলাদেশের নাগরিক। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পশ্চিমবঙ্গেও সুপরিচিত। দুজন হিন্দু। মহিলা একজনও না।

আরেক উপাদান হচ্ছে তলস্তোয়ের জীবন বা রচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের জীবিত ও মৃত বারোজন বিশিষ্ট লেখক-লেখিকার প্রবন্ধ বা জীবনস্মৃতি বা জীবনীর অংশ। এঁদের মধ্যে আছেন রম্যা রলাঁ, ভারজিনিয়া উলফ, ম্যাথ্যু আর্নল্ড, টোমাস মান, স্টেফান ট্সোয়াইগ, সমারসেট মম, ম্যাকসিম গোর্কি, ভিক্তর শ্ক্লোফ্স্কি, বরিস পাস্তি-য়েরনাক, ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন। 'হংসো মধ্যে বকো যথা' অন্নদাশঙ্কর রায় ও সুবীর রায়চৌধুরী। ম্যাথ্যু আর্নল্ড ছিলেন তলস্তোয়ের সমসাময়িক। তাঁর প্রথম পর্যায়ের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিতে 'আন্না কারেনিনা' ছিল বলে আবছা মনে পড়ছে। সম্পাদক সেটি পড়েছেন কি না জানি নে। তার জায়গায় নিয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির অন্যতম 'লিও টলস্টয়'।

আরো এক উপাদান তলস্তোয়ের নিজের লেখা থেকে চয়ন করা ছোটো বড়ো কাহিনী বা কাহিনীর অংশ, উপন্যাসের অংশ, প্রবন্ধ ও চিঠি। মোট বারোটি রচনা। এর

লেভ্ তলস্তোয়। সার্ধজন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি। সম্পাদনা : হায়াৎ মামুদ। অ্যাফ্রো-এশীয় লেখক ইউ-নিয়নের পক্ষে মুক্তধারা, ঢাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫৪। মূল্য : সাদা ৯০ টাকা, বুক-প্রিনট ৭০ টাকা বাংলা-দেশের মুদ্রায়। সাল ১৯৮৫।

মধ্যে আছে 'আন্না কারেনিনা', 'ইভান ইলিচের মৃত্যু', 'ফাদার সিয়েরগি' ও 'ঈশ্বর সত্যদ্রষ্টা'। তা ছাড়া শিল্প সম্পর্কে তলস্তোয়ের মতবাদ। তাঁর পারিবারিক জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির উপর আলোকপাত করে স্ত্রীকে লেখা কিন্তু লুকিয়ে-রাখা এক চিঠি।

অবশেষে হায়াৎ মামুদ-কৃত জীবনীপঞ্জি ও বংশলতিকা, বাঙলা গ্রন্থপঞ্জি ও লেখক- তথা অনুবাদক-পরিচিতি। আরো পরে ঢাকা ও চট্টগ্রামের অনুষ্ঠান দুটির স্মরণিকা। এ ছাড়া নির্ঘণ্ট।

শ্রদ্ধাঞ্জলির সূচনায় রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তলস্তোয়ের উপর লেখা সনেট। কবে লেখা, কোন্ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত তার উল্লেখ নেই। সম্ভবত ঋষির মহাপ্রয়াণের পরে কবির তর্পণ। এই অপূর্ব সনেট এর আগে আমার নজরে পড়ে নি। এটি পুনঃপ্রকাশ করে সম্পাদক একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

এই স্মারকগ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তলস্তোয়ের, গোরকির ও পাস্তিয়েরনাকের রুশভাষা থেকে সরাসরি বাঙলায় তরজমা। তরজমাকারদের মধ্যে আছেন সমর সেন, ননী ভৌমিক, হায়াৎ মামুদ প্রভৃতি। আমরা ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত। মুশকিলে পড়েছি ইংরেজির সঙ্গে বাঙলার পাঠ মেলাতে গিয়ে। নমুনা দিচ্ছি। মৃত্যুর পূর্বে ইভান ইলিচ তাঁর স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় আর-একটি শব্দ, যার অর্থ ক্ষমা নয়। ইংরেজি অনুবাদ :

'He tried to add, "forgive me," but said, "forgo" and waved his hand, knowing that He whose understanding mattered would understand. (Translated by Aylmer Maude.)

বাঙলা অনুবাদ : "বলতে চাইলেন 'আমার পাপ ভুলে যাও', কিন্তু বললেন 'আমার পথ ছেড়ে দাও' ; নিজেকে শোধরাবার আর শক্তি ছিল না, হাতটা শুধু একবার নাড়লেন এই জেনে যে, যার বোঝার কথা সে বুঝবে।" (অনুবাদ : সমর সেন।)

'ফরগিভ' বলতে গিয়ে 'ফরগো' বলা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, 'পাপ ভুলে যাও' বলতে গিয়ে 'পথ ছেড়ে দাও' অস্বাভাবিক। তা না হয় হল, কিন্তু 'যার বোঝার কথা'—কার বোঝার কথা ? তিনি কি ঈশ্বর না মানুষ ? ইংরেজি অনুবাদক ছোটো হাতের এইচ না লিখে বড়ো হাতের এইচ লিখে ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি ঈশ্বর। ইভান ইলিচ ঈশ্বরচিন্তা করছিলেন।

আর-একটি নমুনা উল্লেখ করতে গিয়ে হাতের কাছে ইংরেজি অনুবাদ পাচ্ছি নে, বইখানা গোরকির 'তলস্তোয়, চেখভ ও আন্দ্রেইয়েফের স্মৃতি'। হগারথ প্রেস থেকে প্রকাশিত। অনুবাদক একজন রাশিয়ান। দুরকম নারীর প্রতিতুলনা করতে গিয়ে স্ত্রীতত্ত্ববিদ্ তলস্তোয় বলছেন গোরকিকে, "যে রমণী তোমার মালিকানা দখল করে নেয় সে তত বিপজ্জনক নয়, সত্যিকার বিপজ্জনক হল সে যে তোমার আত্মার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।" (অনুবাদ : মেহের কবীর।) অনুবাদ যে সরাসরি রুশ ভাষা থেকে হয়েছে তা উল্লিখিত হয় নি। সম্ভবত ইংরেজি থেকে হয়েছে আর সেটা রুশ সংস্করণ ইংরেজি থেকে। আমি সেরকম একটা অনুবাদও পড়েছি। তাতে রসকষের কথাগুলো বর্জিত কিংবা মার্জিত হয়েছে। হগারথ প্রেস হল ভারজিনিয়া উলফ ও লেওনার্ড উলফের প্রকাশনসংস্থা। অনুবাদক একজন দেশান্তরিত রুশ। সে অনুবাদে 'মালিকানা'-ব্যঞ্জক শব্দটির জায়গায় ড্যাশ দেওয়া হয়েছে। ইঙ্গিত 'পুরুষাঙ্গ'। অবশ্য মালিকানা সেটা ঠিকই। ভাবার্থে মালিকানা। মালিকানা 'দখল করে' নয়, মালিকানা 'ধরে' বা 'ধারণ করে'। তলস্তোয়ের মুখে 'অশ্লীল' শব্দের খই ফুটত। ইংরেজিতে আরো ড্যাশ আছে।

গোরকির স্মৃতিতে আরো অনেক মজার মজার কথা পড়েছি। নারী সম্বন্ধে উক্তি। সারা জীবনেও নারীর সঙ্গে তিনি সন্ধি করতে পারেন নি। গোরকিকে বলেন : "নারী সম্বন্ধে আমি সত্য কথাটি বলব কখন, জান ? কবরে যখন আমাকে শোয়ানো হবে তখন কাফনে শরীর ঢেকে মুখটা খোলা রেখে নারী সম্বন্ধে সত্য কথাটি বলব আর কাফনটা মুখের উপর টেনে দেব।" ইংরেজি অনুবাদ হাতের কাছে নেই, এটা ভাবানুবাদ।

তলস্তোয়কে চেনবার সেরা উপায় তাঁর ওইসব দিলখোলা কথাবার্তা, যার শ্রোতা গোরকির মতো অন্তরঙ্গ শিল্পী। শতং বদ, মা লিখ। লিখতে হলে সব দিক বাঁচিয়ে লিখতে হয়। সেনসর কী মনে করবেন, পাবলিক কী মনে করবে, পরিবার কী মনে করবে ? তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয় নি, সেগুলিতে নরনারী-সম্পর্কই প্রধান বিষয়। 'ফাদার সিয়েগি'কে বলতে পারা যায় 'টেম্পটেশনস অভ্ ফাদার সিয়েরগি।' খ্রীষ্টীয় সাধুদের জীবনে নারীঘটিত প্রলোভনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। সিয়েরগি প্রথমবার জেতেন, পরের বার হেরে যান। তলস্তোয়ের বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যান বৃহত্তর জনসমাজে, নতুন করে শিক্ষা দেন একটি কর্তব্যপরায়ণা দরিদ্র গৃহিণীর কাছে, তারপরে সাইবেরিয়ায়, যেখানে সিয়েরগি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রতিদিনকার রুটি রোজকার করেন। পরের শ্রমে মঠবাসী বা গুহাবাসী সাধুর জীবন অতিবাহিত করেন না।

শ্রম করে ফসল ফলাবে, কাপড় বুনবে, বাড়ি তৈরি করবে, শহর বানাবে সমাজের বৃহত্তমসংখ্যক মানুষ আর তাদের শ্রমের ফল ভোগ করবে সমাজের ক্ষুদ্রতমসংখ্যক যারা পরিবর্তে এমন কিছু দেয় না যা সমান মূল্যবান,

এই যে সামাজিক অন্যায় এর ভাগী সম্রাট থেকে আরম্ভ করে অভিজাত, বুরজোয়া, বুরোক্রাট ও পাদ্রী এই কয়টি ভগ্নাংশ। এঁদের বিরুদ্ধে তলস্তোয় একাই একটা জেহাদ চালান। সে জেহাদ তাঁর মৃত্যুর সাত বছর বাদে বিপ্লবের আকার নেয়, সে বিপ্লব সফলও হয়। কোথায় ভেসে যান সম্রাট, অভিজাত, বুরজোয়া আর পাদ্রীর দল। বুরোক্রাটরা কিন্তু ভোল বদল করে এখনো বিদ্যমান। নিচের থেকে নিত্য নতুন বুরোক্রাট উঠছেন। তাঁরাই খেতখামার, ব্যাবসাবাণিজ্য, কলকারখানা, বাঁধনির্মাণ, অস্ত্র-উৎপাদন ইত্যাদি পরিচালনা করছেন। একই শ্রেণীর লোকই পার্টির পরিচালক হতে-হতে রাষ্ট্রের পরিচালক। সামাজিক ন্যায় কি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? গিরজা নেই, কিন্তু রাষ্ট্র তো আরো জবরদস্ত। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি তলস্তোয়ের সময় যেমন ছিল তার চেয়ে আরো সর্বাত্মক হয়েছে। কনস্ক্রিপশন উঠে যাওয়া দূরে থাক, জাঁকিয়ে বসেছে। তলস্তোয় কি এই চেয়েছিলেন ? বেঁচে থাকলে তিনি কি এর বিরুদ্ধেও জেহাদ চালাতেন না ? তলস্তোয়বাদ মার্কসবাদ নয়। মার্কসবাদের সাফল্য তলস্তোয়বাদের সাফল্য নয়।

যে তলস্তোয় অপ্রতিরোধ মতবাদের প্রবক্তা তাঁর স্থান আজ তাঁর স্বদেশে নেই, থাকলে ভারতেই কতক পরিমাণে আছে। সীমিতসংখ্যক গান্ধীপন্থীর জীবনে। কিন্তু যে তলস্তোয় মহাশিল্পী তাঁর স্থান সব দেশে। তবে সব কালে কি না বলা সম্ভব নয়। কোথাও বিশেষ কেউ তাঁর অনুসরণ করছেন না। সেরকম উপন্যাস বা গল্প আর লেখা হচ্ছে না। ধারা বদলে গেছে। রীতি বদলে গেছে। উপজীব্য জীবন বদলে গেছে। তবে কতক সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা তাঁরই মতো জীবনের অর্থ খুঁজছেন, নীতিজিজ্ঞাসায় নিবিষ্ট রয়েছেন, ঈশ্বরবিশ্বাসে দৃঢ় না হলেও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে আস্থা রাখেন। উপন্যাসকে তলস্তোয় যে উচ্চতা দিয়েছেন তা কেবল শিল্পকর্মসঞ্জাত নয়, সেইসঙ্গে জীবনদর্শনসম্পৃক্ত।

তাঁর শিল্পকর্মের উৎকর্ষ তাঁকে তাঁর বাহান্ন বছর বয়সের মধ্যেই এনে দেয় যশ ও বিত্ত, মানসম্মান, বিশ্বময় পাঠক। এমন সময় তাঁর মনে হয় সবকিছু অন্তঃসারশূন্য। অন্তঃসার থাকা চাই। না থাকলে জীবন বৃথা, শিল্প বৃথা। তিনি সব সময় একগাছা দড়ি সঙ্গে রাখেন। নিরুপায় হলে গলায় দড়ি দেবেন। জীবনটাকে তিনি ঢেলে সাজাতে চান। শিল্পকর্মকেও। শুধু তাঁর আপনার বেলা নয়। পরিবারের বেলাও, অভিজাত শ্রেণীর বেলাও, বুরজোয়া শ্রেণীর বেলাও, খ্রীষ্টীয় চার্চের বেলাও। তেমনি, কেবল নিজের শিল্পকর্মের বেলা নয়, অন্যান্য শিল্পীদের বেলাও। আধুনিক সভ্যতাকেও, পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও তিনি খোলনলচে-সমেত বদলে দিতে চান। তাঁর আদর্শ যীশুবর্ণিত ভগবানের রাজ্য। আদি খ্রীষ্টানদের দ্বারা যা রূপায়িত হয়েছিল। সরল, শান্ত, অহিংস, কায়িকশ্রমনির্ভর জীবন। সরল, সহজ, সর্বজনভোগ্য, সর্বজনসৃষ্ট শিল্পকর্ম। মস্তিস্কজাত চাতুরীবর্জিত। অকপট। অকৃত্রিম।

দেশে সংস্কারবাদী ও বিপ্লববাদীর অভাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শোষণহীন সমাজ কল্পনা করেন তাঁরা শাসনহীন সমাজ কল্পনা করতে পারেন না। যাঁরা শাসনহীন সমাজ কল্পনা করেন তাঁরা হিংসাহীন সমাজ কল্পনা করতে পারেন না। যেখানে মানুষ মানুষকে মারে সেখানে মানবপ্রেম থাকতে পারে না। যেখানে মানবপ্রেম নেই সেখানে ঈশ্বরপ্রেম থাকতে পারে না। যেখানে ঈশ্বরপ্রেম নেই সেখানে জাগতিক প্রগতি অন্তঃসারশূন্য। যারা খ্রীষ্টানুসরণ করবে তাদের লক্ষ্য ভগবানের রাজ্য। ভগবানের রাজ্যে পৌঁছবার পন্থা প্রেমের পন্থা, অহিংসার পন্থা, কায়িক শ্রমের পন্থা, নীতিনিষ্ঠতার পন্থা। কোনোমতে একটা ওলটপালট ঘটানোই শ্রেয় নয়। উদ্দেশ্য যদি শুভ হয়, উপায় অশুভ হলে চলবে না। উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়ই শুভ হওয়া চাই। শুদ্ধ হওয়া চাই।

এই যে কট্টর মতবাদ, তলস্তোয় এর অনুসরণ দেখতে পান তাঁর স্বদেশেরই দুখোবর সম্প্রদায়ের জীবনে। তারা গতর খাটিয়ে খায়, পরশ্রমজীবী নয়। মানুষ মরবে না বলে সৈন্যদলে যোগ দেয় না, আত্মরক্ষার জন্যেও অস্ত্রধারণ করে না। সরকার তাদের সৈন্যদলে ভর্তি করার জন্যে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে তারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করে। জেলে যায়। সাইবেরিয়ায় চালান যায়। প্রাণ বিসর্জন দেয়। শেষে এই স্থির হয় যে তারা দেশান্তরী হবে। তার জন্যে টাকার দরকার। টাকা তোলার দায় কাঁধে তুলে নেন তলস্তোয়। তার জন্যে 'রেজারেকশন' উপন্যাস লেখেন। প্রচুর বিক্রি হয়। সঙ্গে-সঙ্গে তরজমা হয়। তরজমা থেকেও প্রচুর অর্থ ওঠে। সমস্ত যায় দুখোবরদের দেশান্তরযাত্রার খরচ মেটাতে। তারা তখন কানাডায় গিয়ে বসবাস করে। তখনকার দিনে ইংলন্ড, আমেরিকা, কানাডার মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কনস্ক্রিপশন ছিল না। তলস্তোয় বেঁচে থাকলে দেখতেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সেসব রাষ্ট্রেও উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্স, জারমানি ও রাশিয়ার মতো এই কুপ্রথা প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তো গোড়া থেকেই। লিবার্টি যাদের মোক্ষ তারাও অকাতরে মানুষকে ধরে নিয়ে যায় মানুষ মারার জন্যে। লিবার্টির চেয়ে প্রপার্টি আরো মূল্যবান। দেশান্তরিত দুখোবরদের হাল আমার অজানা। তপ্ত কটাহ থেকে তারা জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দেয় নি তো ? যাক, 'রেজারেকশনে'র মতো একখানা অমর গ্রন্থ লেখা হয়ে গেল।

তলস্তোয় আশা করেছিলেন সময় থাকতে তাঁর দেশের শাসক ও শোষক শ্রেণীর অন্তঃপরিবর্তন হবে। যুদ্ধ এবং বিপ্লব নিবারিত হবে। তবে এটাও তিনি জানতেন যে অন্তঃ-

পরিবর্তন না হলে কোনোটাই নিবারিত হবে না। তিনি যেমন কট্টর আদর্শবাদী ছিলেন তেমনি কট্টর বাস্তববাদীও। রুশ বিপ্লবের পর তাঁর এক পুত্র তাঁকে দোষ দেন এই বলে যে, "বাবার জন্যেই বিপ্লবটা হলো।" পুত্রের মতে যেটা দোষ, খোদ বিপ্লবীদের মতে সেটা গুণ। কিন্তু শুধু তলস্তোয়ের বেলাই বা কেন? তুরগিয়েনেফের বেলাও কেন নয়? 'ভারজিন সয়েল' উপন্যাসে কি বিপ্লবের পদধ্বনি নেই? আরো কারো-কারো নামও করা যায়। দস্তইয়েফ্স্কির 'ডেভিল্স' বা 'পজেস্ড' উপন্যাসেও একপ্রকার বিপ্লবপন্থার আভাস আছে। সেই ডিসেমব্রিস্টদের আমল থেকেই রাশিয়ায় বিপ্লবের ছায়া পড়েছিল। সেরকম একটা উদ্যোগে জড়িয়ে পড়ে দস্তইয়েভ্স্কি তো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করার জন্যে যদি কাউকে দোষে গুণে দায়ী করতে হয় তবে উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের একভাগকেও। তবে বিপ্লব বলতে বোঝাত ফরাসি বিপ্লবের অনুরূপ এক বিপ্লব, রোমানটিক বিপ্লব। বোলশেভিকদের বিপ্লব আর যাই হোক রোমানটিক নয়। তার উপর ভিত্তি করে কোনো রোমানটিক কবিতা বা উপন্যাস বা সংগীত রচিত হয় নি।

তলস্তোয়ের শিল্পীসত্তা তাঁর ঋষিসত্তা-দ্বারা ব্যাহত হলেও আচ্ছন্ন হয় নি। আমরা এদেশের লোক, তাঁর ঋষিসত্তার সঙ্গেই অধিকতর পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী তাঁকে সেইভাবেই গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে এসে সেই অর্থেই একজন 'টলস্টয়ান' বলে আত্মপরিচয় দেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সনেটে তাঁকে ঋষি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। পরে কবি বলে অভিহিত করলেও সেটা ঋষিরই কবিরূপ। পুরোদস্তর তরজমা কেবল ছোটো-ছোটো কাহিনীগুলিরই হয়েছে। বড়ো-বড়ো উপন্যাসগুলির সংক্ষেপিত ভাবানুবাদই দেখা যায়। তবে মসকোতে বসে 'রাদুগা প্রকাশনে'র আনুকূল্যে ননী ভৌমিক 'আন্না কারেনিনা'র যে অনুবাদ করেছেন তা বোধ হয় সম্পূর্ণ উপন্যাসের মূলানুগ অনুবাদ। আলোচ্য স্মারকগ্রন্থে তার ক্ষুদ্র একটি অংশ আছে। আন্নার আত্মহত্যার বর্ণনা। এই অনুবাদ ষাট বছর আগে হলে বাঙলা উপন্যাসের উপর তার প্রভাব পড়ত। এখন বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে। একালের আন্নারা আত্মঘাতিনী হন না। তাঁরা অনায়াসেই ডিভোর্স পান ও আবার বিয়ে করেন বা স্বাবলম্বী হন। সমাজও তাঁদের ত্যাগ করে না। পাপপুণ্যের বিচারও আর সেরকম গোঁড়া নয়।

তলস্তোয়ের বাঙলা তরজমার তালিকাটি ক্ষুদ্র নয়। প্রথম অনুবাদ 'চল্লিশ বছর' ১৯০৩ সালে। অনুবাদ চণ্ডীচরণ সেন। হ্যারিয়েট বীচার স্টো-লিখিত উপন্যাসের অনুবাদ 'টমকাকার কুটির' লিখে নাম করেন। কবি কামিনী রায় এঁরই কন্যা। ইনি অনুবাদ করেন 'ধর্মপত্র' ১৯০৭ সালে। (সম্পাদকীয় মন্তব্য : ডকটর কেশব চক্রবর্তীর মতে সালটা হবে ১৮৯৪। ভ্রমবশত ১৯০৭ ছাপা হয়েছিল। তা যদি হয় তবে 'ধর্মপত্র'ই প্রথম।) দীর্ঘ ব্যবধানের পর ১৯২০ সালে 'টলস্টয়ের গল্পবিংশতি'। অনুবাদক চারুচন্দ্র গুহ। ইংরেজি সংস্করণে ছিল তেইশটি গল্প। তার শেষেরটি 'তিনটি গল্প'। আমিই অনুবাদক। ছাপা হয় সেই ১৯২০ সালেই। ষাট বছর পরে আমার 'টলস্টয়' পুস্তকের শামিল হয়।

তখন থেকেই অনুবাদকর্ম সমানে চলে এসেছে ১৯৮৪ সাল ইস্তক। সাধারণত একই কাহিনীর একাধিক অনুবাদ। প্রধানত কলকাতা থেকে, কিছু ঢাকা থেকে, অবশিষ্ট মস্কো থেকে। অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বিমল কর, সাবিত্রী ঘোষাল, মঞ্জরী চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, হায়াৎ মামুদ, ননী ভৌমিক, সমর সেন, আকবর উদ্দীন, সৈয়দ আব্দুল মানান, আব্দুল হানান কোরাইশী প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ অনুবাদ করেছেন 'শিল্পের স্বরূপ'। ঋষি তলস্তোয়ের গভীরতর-চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি এখনো অনূদিত হয় নি। মস্কো হয়তো করবে না। কলকাতা আর ঢাকাকেই করতে হবে।

বাঙলা ভাষায় তলস্তোয়-সম্পর্কিত রচনার একটি কালানুক্রমিক তালিকা এই স্মারকগ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী আরম্ভ করেন ১৯২১ সালে 'টলস্টয়ের জীবন' দিয়ে। শেষ রচনা ঝরা বসুর 'ভারত-পথিক টলস্টয়', ১৯৮৩। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন ও আছেন উপরোক্ত অনুবাদকদের কয়েকজন ব্যতীত হেমন্তকুমার সরকার, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, গোপাল হালদার, কেশব চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি। সম্পাদক হায়াৎ মামুদ বহু আকরগ্রন্থ মন্থন করে সংকলন করেছেন তলস্তোয়ের জীবনীপঞ্জি। এমনটি আর কোথাও আমি দেখি নি। দোষে গুণে তলস্তোয় ছিলেন অসাধারণ পুরুষ। খুশি হচ্ছি দেখে যে সম্পাদক আক্সিনিয়া ও তিমোফিয়েইকে স্থান দিয়েছেন। এটি একটি সুন্দর উপাখ্যান। মহাভারতের উপাখ্যানের মতো। তলস্তোয় তো স্বীকারই করতে চান নি যে পরকীয়াপ্রসূত তিমোফিয়েই তাঁরই ঔরসজাত। পরিবারের আর সকলে তা করেন। আশ্চর্য সাদৃশ্য! ছেলেটাকে মানুষ করলে তাকে কোচম্যান হতে হত না। একই ব্যাপার ঘটেছিল তাঁর পিতার জীবনেও। তস্য পুত্রটিও কোচম্যান। তুরগিয়েনেভ এক্ষেত্রে আদর্শ জনক। তিনি তাঁর কন্যাকে প্যারিসে সুশিক্ষিতা করে এক অভিজাত পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। খরচও করেন বিস্তর। লুকোচুরির ধার ধারতেন না। তবে দেশান্তরী হতে হয়েছিল।

বাকি থাকে সেমিনার প্রসঙ্গ। মাহবুব-উল আলম, আবুল ফজল, মাহবুবুল হক, সরদার ফজলুল করিম, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, যতীন সরকার, কবীর চৌধুরী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আলী আনোয়ার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রেজাউল করিম, সনৎকুমার সাহা, জিয়া হায়দার ও ইউরি দ্মিত্রিভিচ অ্যাক্সিওনফ অংশগ্রহণ করেন। এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যেই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। ইলিয়াস উদ্ধার করেছেন অনেকগুলি অজানা তথ্য। সেই যে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যিনি ভানুসিংহ ঠাকুরকে মধ্যযুগের পদাবলীকার বলে তাঁর থিসিসে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি বারলিন থেকে সেনট পিটারসবুরগে গিয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনিই প্রথম ১৮৭৮ সালে বাঙলাদেশের পাঠককে টলস্টয়ের পরিচয় জানালেন 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে। আজরফের মতে ইউরোপীয় "রিনেসাঁস আন্দোলনের উদ্যোগে ব্যষ্টিজীবনের স্বাধীনতা লাভ করার অদম্য উৎসাহে, মানবসভ্যতায় খ্রীষ্টধর্মের অবদানগুলোকে অস্বীকার করে—গ্রীক সংস্কৃতির অনুসরণ করে—সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নৈতিক মূল্যগুলোকে অপসারিত করে প্যাগান সভ্যতার নীতিগুলোর প্রতিষ্ঠা করতে ছিলেন উদ্যোগী।" তাঁরা যার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার নাম হিউমানিজম। অতিপ্রাকৃতকেই তাঁরা অপসারিত করেন, নৈতিক মূল্যমানগুলোকে নয়। রেনেসাঁসের সঙ্গে চার্চের বিরোধ বাধে যখন পৃথিবী স্থির না থেকে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। যখন আকাশে স্বর্গ ও পাতালে নরক অবস্থিত হয় না। যখন খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্ব আর বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কিছুতেই মেলানো যায় না। এর জন্যে উদ্যোক্তারা দায়ী ছিলেন না। ধর্মীয় বিষয় ভিন্ন আর সব বিষয়ে ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া নিষিদ্ধ ছিল। শল্যবিদ্যার প্রয়োজনে শবব্যবচ্ছেদ করতে পারা যেত না। অ্যানাটোমি জ্ঞানের পর চিত্রাঙ্কন ও মূর্তিগঠনের ধারা বদলে যায়। বাস্তবতার অনুরোধে অনাবৃত দেহ আঁকতে হয় বা গড়তে হয়। চরিত্রগত দোষ গুণ আগেও যেমন ছিল পরেও তেমনি থাকে। মূল্যবোধের পরিবর্তন যা হয় তা দুই শতাব্দী পরে। এনলাইটেনমেনটের পরে। তার থেকে আসে ফরাসি বিপ্লব। আরো পরে দাসপ্রথার অবসান। রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথা লোপ। প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে এসব মেলে না। যুক্তির মুক্তি থেকে এসব আসে। ভক্তির যুগে এসব ছিল। খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ সত্যকে তেমন মূল্য দেয় নি বিশ্বাসকে তথা ব্রহ্মচর্যকে যেমন। রেনেসাঁসের উদ্যোক্তারা সত্যসন্ধ। তথা প্রকৃতি-অনুসারী।

আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে আলী আনোয়ারের 'যুদ্ধ ও শান্তি' নিয়ে আলোচনা। এই উপন্যাসটিই তলস্তোয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত। তলস্তোয় ভিন্ন আর কেউ এ গ্রন্থ লিখতে পারতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তিনি যুদ্ধের স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করে আসেন। তবে উপন্যাসের উপসংহারে ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর সমীক্ষা ঐতিহাসিকদের বা দার্শনিকদের গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য এইখানে যে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করে রুশদেশের নিরস্ত্র জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও সামগ্রিক প্রতিরোধ। তারা মস্কো ছেড়ে যায়, যাবার সময় শহর পুড়িয়ে দিয়ে যায়। নেপোলিয়ন এর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেন নি। তাঁর জয় জয়ই নয়। তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। জনগণের মনোবলই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে। জনগণ বলতে প্রধানত কৃষকই বোঝায়। কৃষকদের সঙ্গে তলস্তোয়ের সম্পর্ক কেবল ঘনিষ্ঠ নয়, সশ্রদ্ধ। প্লাতোন কারাভায়েভ নামক দরিদ্র মুঝিক চাষীটি রুশ জনগণের প্রতীক। যে জনগণ পরবর্তী কালে রুশ বিপ্লবেরও নায়ক। কৃষকরাও বিপ্লবী না হলে শ্রমিকরা সফল হত না।

এই প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরো বিশদ আলোচনা করেছেন। তলস্তোয় কৃষকের সঙ্গে কৃষক হতে চেয়েছিলেন, চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু হতে পারেন নি, পারতেনও না গৃহত্যাগের পরে, গৃহত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে সম্পত্তিত্যাগের পরে। আসল কারণটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিঘটিত নয়, কায়িক শ্রমঘটিতও নয়, খানদানি মানসম্ভ্রমঘটিত। কোথায় এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, লোকে ভেবেছিল তিনি চাষানী বিয়ে করবেন। তিনি সেটা উড়িয়ে দিয়েছেন। চাষানীর সঙ্গসুখ এক জিনিস, তাতে তিনি সুখীও হয়েছিলেন, তেমন সুখ ভদ্রাণীর সঙ্গে হবার নয়। ভদ্রাণীরা নিতান্ত নিরুত্তাপ পাষাণী। বিয়ে, সে যে অন্য জিনিস। আমার বিশ্বাস হয় না বিপ্লবের পরেও ভদ্রঘরের বিপ্লবীরা কেউ চাষানী বা মজুরনী বিয়ে করেছেন। সেইটেই অ্যাসিড টেস্ট। প্রতিলোমেই তাঁদের আগ্রহ, অনুলোমে নয়। শ্রেণীশূন্য সমাজ এখনো বহু দূরে। তার জন্যে আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে থাকব। জীবনে না হোক, অন্তত উপন্যাসে সেই ব্যবধানটা কেউ অতিক্রম করতে পারেন কি না দেখা যাক। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে আমার কোনো ইলিউশন নেই। আমাদের বিপ্লবীরা চিরকাল বাবু।

আরেক জীবনে উত্তরণের যন্ত্রণা

যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা—আবুল কাসেম ফজলুল হক। এম এন ও পাবলিকেশসন লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ। পনেরো টাকা।

পৌরুষের অভাবই মানবচরিত্রের সবচাইতে বড়ো কলঙ্ক। পক্ষপাতশূন্য হয়ে নিজের এবং অপর জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভালোমন্দ, উন্নতি-অবনতির বিচার করতে পারেন, দরদী বলিষ্ঠ মন নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন—এমন মানুষ বিরল। মনের নিরালম্ব বিস্তার-বিক্ষেপ ছড়িয়ে যে-মানুষ একটি ধ্রুব বিশ্বাসকে নিরপেক্ষ দরদী উদারতায় মানবদরবারে উপস্থিত করতে পারেন, মন দিয়ে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হন, মত দিয়ে কাঁটার বন আরো কণ্টকিত করার চটকদার প্রয়াসে বেসামাল হয়ে পড়েন না, সেই মানুষের সংখ্যা ক্ষীণ হয়ে আসছে। 'যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা'র লেখক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠার সঙ্গে মন দিয়ে সত্যের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন এবং তাঁর বহু বক্তব্য শুদ্ধ ভাষার প্রলেপে আবৃত না হয়ে হৃদয়ের জারক রসে আপ্লুত হয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে।

গ্রন্থকার ষাটের আর সত্তরের দশকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিকায় যে বাস্তব এবং খাঁটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়িত করেছেন তার বিস্তৃতি আরো ব্যাপক হলে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন আরো বেশি উপভোগ্য হত। বাংলাদেশের নানা ক্ষেত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারা, যুগসন্ধিক্ষণের জটিলতা, তীব্র যুগযন্ত্রণা, বুদ্ধিজীবী তথা নেতাদের ভাবনা-চিন্তার আবিলতা, ব্যক্তিজীবনের সহজ-সুন্দর প্রকাশের পথকে অবরোধ করার জন্য নিকৃষ্টতার পূজকদের মনোবৃত্তি, ইত্যাদি ফজলুল হক সাহেবকে বিচলিত করেছে। তিনি আর-দশজনের মতো বিচলিত বা বিমর্ষ হয়েই দূর থেকে সবকিছু দেখেশুনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে পড়ে থাকেন নি, গত ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরে ওপার-বাঙলায় যে প্রলয়ের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে এবং সেই ভয়ংকর দুর্যোগে বাঙলাদেশের সবুজের দল জীবন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে যে পাপমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিল, সে-জীবন-মহাকাব্যের এমন সুন্দর সংক্ষিপ্ত মহাভাষ্য 'যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা'র আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

গ্রন্থসমালোচনা

যুগসংক্রান্তির সঙ্গে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসগত পরিস্থিতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমাজের শ্রেণীগত গঠন, বিন্যাস এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। ঐতিহাসিক সূত্র ধরে যুগ-পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক আন্দোলনে গতিপ্রকৃতির কলাকৌশল, স্বৈরাচার-তন্ত্রের অভিসন্ধি, তরুণসমাজের প্রতিবাদসহ আত্মাহুতির দৃঢ় সংকল্প—এই সবকিছু মিলিয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনজীবনকে যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত করে তখন ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বলিষ্ঠতাই বিপন্ন সমাজ তথা দেশকে ক্লেদমুক্ত করতে পারে। উন্নততর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নততর সমাজসংস্থা, বৈষয়িক এবং মানসিক সমুন্নতি ছাড়া গতানুগতিক স্বার্থমগ্ন মনসবদারদের অনুকম্পায় এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রহসনের চালিয়াতির চমক একটা উন্নতির নেশায় মশগুল দেশকে লক্ষ্যে পোঁছে দিতে পারে না।

১৬টি ছোটো-ছোটো অধ্যায়ে মাত্র ৫১ পৃষ্ঠায় ফজলুল হক সাহেব তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টির, সুদৃঢ় সংযত ভাবনা-চিন্তার অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন।

গোটা পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মহৎ ব্যক্তিরা চিরকাল বড়ো-বড়ো স্বার্থত্যাগ করেছেন, সাধারণ মানুষ তার শুভ ফল ভোগ করে অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা—"দাদা, লিডার কি বানাতে পারা যায়? লিডার জন্মায়। লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগান। জেলাসি, সেলফিস্‌নেস্‌ আদপে থাকবে না—তবে লিডার। প্রথম বাই বার্থ (জন্মগত), দ্বিতীয় আন্‌সেলফিস্‌ (নিঃস্বার্থ), তবে লিডার।" বিবেকানন্দের কথাগুলো এপার-ওপার দুই বাঙলার পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য।

ক্রিপস - র‍্যাডক্লিফ - চারচিল- মাউনটব্যাটেনরূপী শ্বেতদ্বীপের শাথামৃগরা নিজেরা তখতে বসে স্বচ্ছন্দে অখণ্ড ভারতের তা-বড়ো তা-বড়ো লীডারদের জগৎসমক্ষে নাচিয়েছেন। নেতৃত্বের জন্মগত যোগ্যতার অভাব, এবং সেই সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্লজ্জ কানাকানি, অপরিকল্পিত অনির্ণীত অপরিণামদর্শিতা ভারতবর্ষকে বিক্ষত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অখণ্ড বাঙলার দুরপনেয় বিভাজন। 'যুগজিজ্ঞাসার মোকাবিলায় আতঙ্ক কেন?' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার লিখেছেন—"বাঙলাদেশের সমাজ এক ক্রান্তিকালের বা যুগসংক্রান্তির বা যুগসন্ধির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে—একথা অনেক দিন ধরে অনেকেই বলছেন। কিন্তু এ যেন শুধু বলার জন্য ভাসাভাসাভাবে বলা।" গ্রন্থকারের এই উক্তি শুধু বাংলাদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য নয়, এপার-বাঙলার মানুষেরও ভেবে দেখার বিষয়। রাজনৈতিক দাবার চালে অনেক অঘটনের চটক সাময়িক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের আরেক চালে গোটা খেলার চেহারাও যে পালটে দিতে পারে, ইতিহাসে সে-নজিরের অভাব নেই।

"এদেশে কারও মনে কোন গুরুতর জিজ্ঞাসা নেই, কিংবা কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করছেন না—এমন কথা আমি বলছি না।" লেখক এক্ষেত্রে যথাযথ সংযত, পরিশীলিত মনের পরিচয় দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন—"জাতীয় জীবনের কেন্দ্রীয় গুরুত্বের এমন কিছু প্রশ্নের কথা আছে যেগুলোর মীমাংসা গায়ের জোরে করা যায় না।" যে বিরাজমান উত্তেজনাকর সামাজিক পরিস্থিতি লেখককে সংগত কারণেই চঞ্চল করে তুলেছে সে সবকিছুই এককভাবে বাংলাদেশের সমস্যা বলে মনে হয় না; সেগুলো একালের অনেক দেশেরই জীবন-মরণসমস্যার সঙ্গে জড়িত।

"জনস্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের দেশ আজ সাধারণভাবে অধোগামী; উন্নয়ন উত্তরণ ও উত্থানের প্রয়াস জনগণের মধ্যে আছে, বিরাটভাবেই আছে, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো তার আত্মপ্রকাশও ঘটে।" লেখক খোলা মনে খোলা চোখে বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তব রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর সেই কারণেই বাঙালি বলেই, যে নামেই পরিচায়িত হোক না কেন, বাঙালির প্রয়াস যতবারই পরাজিত হোক না কেন, অপরাজেয় মনোবল কখনও দ্বিখণ্ডিত হয় না—তা সে ১৭৫৭-তেই হোক কিংবা ১৯৪৭-এই হোক।

সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য লোকদেখানো প্রচেষ্টা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ, সাধারণ মানুষের মন ভুলিয়ে হীন-স্বার্থসিদ্ধির জন্য জঘন্য স্বার্থপরতার নির্লজ্জ আয়োজন একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষকে ক্ষমতার শিখরে স্থান দিয়েছে। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধনের ভাঁওতা দিয়ে লোকদেখানো প্রচারব্যবস্থাও আছে, কিন্তু আসল কাজের জন্য খাঁটি সুস্থ লোকের দেখা মিলছে না। এ পরিতাপ শুধু বাংলাদেশের আকাশবাতাসেই হাহাকার করে ঘুরছে না, প্রমত্ত পদ্মার প্রচণ্ড ঢেউ অতিক্রম করে ওপার-বাঙলার বিষণ্ণতা এপার-বাঙলার বুকেও আছড়ে পড়ে।

এত স্বল্প পরিসরে 'যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে আবুল কাসেম ফজলুল হক সর্বব্যাপী সংকটের চমৎকার বিচারবিশ্লেষণ করেছেন, এবং সেই সঙ্গে অনন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ মতামত উপস্থাপন করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আরো বিশদ অনুশীলন-সহ তাঁর নিজের বিচার-বিশ্লেষণ অবলম্বনে একখানি বড়ো বই রচনা করলে দেশবিদেশের অনেকেই লেখকের কাছে উপকৃত হবেন।

জীবনবল্লভ চৌধুরী

ওপার বাংলার পত্র-পত্রিকা

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িক পত্র. (প্রথম খণ্ড)।—মুনতাসীর মামুন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

সংবাদপত্র আর আধুনিক সভ্যতা পরস্পরপরিপূরক এবং পরস্পরনির্ভর দুটি শব্দ—বিশেষ করে আজকের দিনে। অথচ পত্র-পত্রিকার এই অপরিহার্যতার ইতিহাস আমাদের দেশে খুব একটা প্রাচীন নয়। কিছুকাল মাত্র হল দেড়শো বছর অতিক্রম করেছে। ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা সংবাদপত্রের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল—তার আগে সংবাদ সরবরাহ এবং সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত আর রাজকীয় প্রয়োজনে—বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সংযোগ ছিল অনুপস্থিত। মাত্র দুশো পাঁচ বছর আগে, ২৯ জানুয়ারি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, হিকি সাহেব এ দেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করলেও ১৮১৮ সালে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'-ই বাঙালি-সম্পাদিত পত্রিকার আদি। অবশ্য মিশনারি-প্রচারিত 'দিগ্‌দর্শন' এবং 'সমাচারদর্পণ' এর মাত্র দুমাস আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দটি ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এটি স্বাধীন মত প্রকাশের দিক থেকেও যতখানি উল্লেখযোগ্য, তেমনি মতামতের স্বাধীনতা হরণের জন্য ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী চেষ্টাও হয়েছিল এ বছরেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দু-খণ্ডে প্রকাশিত বাংলা-সাময়িক-পত্র গ্রন্থের সূচনাকাল তাই সংগত কারণেই ১৮১৮ খৃষ্টাব্দকে ধরেছিলেন। বস্তুত, তাঁর এই বই এবং

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (দু খণ্ড) বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্রের প্রধানতম আকরগ্রন্থ। এর পাশে সমমর্যাদাসম্পন্ন আরও একটি বই হল পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে সেকালের সমাজচিত্র'। পরবর্তী কালে সংবাদপত্র নিয়ে বঙ্গদেশের পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় অংশেই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা হলেও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনয় ঘোষের গ্রন্থ দুটিকেই বিদ্বানেরা আকরগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন। এ সম্মান তাঁদের অবশ্য প্রাপ্য।

তবুও গবেষণা থেমে থাকে না। তাই নানা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙলা সংবাদপত্রের নানা আধুনিক মূল্যায়ন হয়ে চলেছে। রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে উভয় বঙ্গের যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু সংস্কৃতিমনা মানুষের মনের দুয়ারে সম্ভবত আগল তুলে দিতে পারে নি। তবুও ভারতীয় তথা বঙ্গসংস্কৃতিতে দুটি জাতিগত সংস্কার প্রবল হয়ে যে উঠেছে, তাকেও অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু সংস্কৃতির পাশে মুসলমান সংস্কৃতির আলোচনাও তাই সমান গুরুত্ব পেয়েছে বর্তমান কালে। অথচ একটা সময় ছিল যখন উভয় সংস্কৃতিকে একপাত্রে রেখে তার আস্বাদ গ্রহণ করা হত। জানি না কোনো গুপ্ত মনোভাব উভয়কে দূরবর্তী করে দিয়েছে কি না। কিন্তু গবেষণাক্ষেত্রে এর ফলে একটা লাভ হয়েছে—অনুপুঙ্খ বিবরণে গবেষণা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এরই ফলে ডক্টর আনিসুজ্জামানের বিশালায়তন 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' বা মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত'-এর মতো উন্নতমনা গবেষণাগ্রন্থগুলি আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য—শেষোক্ত বইটি ঢাকা থেকে ১৯৭৭ সালে মুদ্রিত হলেও শ্রীযুক্ত ইস্‌লাম তাঁর এই গবেষণার প্রথম ফসল সম্ভবত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার (শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু-সম্পাদিত) ১৩৮০ বঙ্গাব্দের পূজা সংখ্যায় 'বাঙালী মুসলমানের সাময়িক পত্র-সাধনা' শীর্ষক পঞ্জী-শ্রেণীর রচনায় প্রকাশ করেছিলেন।

অতিসম্প্রতি এই অনুপুঙ্খ গবেষণার আরও একটি ফসল রাজনৈতিক বেড়া ডিঙিয়ে এসে এপার-বাঙলার অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে। সেটি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সখ্যাত অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন-এর 'উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র'। ঢাকায় বাংলা একাডেমী এটি গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম থেকে স্বতই প্রমাণিত হচ্ছে যে এটি বাংলাদেশের অর্থাৎ প্রাক্তন পূর্ববঙ্গের পত্র-পত্রিকা সম্পর্কিত বই এবং এর পরিধি উনিশ শতক. যদিও গ্রন্থকার মামুন বঙ্গবিভাগের আদি উদ্যোগের কথা স্মরণ করে তাঁর আলোচনার পরিধিকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন।

অধুনা বাংলাদেশে সাময়িকপত্রসমূহ নিয়ে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ পকাশিত হলেও পুনরায় একই বিষয় নিয়ে গ্রন্থপ্রকাশের কারণ গ্রন্থকার তাঁর 'নিবেদন' ও '১'-সংখ্যক অংশে বিজ্ঞাপিত করেছেন। সেগুলি হল—১. ব্রজেন্দ্রনাথ ও বিনয় ঘোষের গবেষণা কলকাতাকেন্দ্রিক পত্রিকাগুলিকে নিয়ে। ২. আনিসুজ্জামান ১৮৭১-১৯২০ পর্বের পত্র-পত্রিকাসমূহকে নিলেও তাঁর গ্রন্থ পঞ্জিকা-ধর্মী। ৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম আনিসুজ্জামানের মতোই উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙালি মুসলিম মানসভাবনার পরিচয় দিতে গিয়ে কেবল সংকলনের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের দুজনের কেউই 'বর্তমান বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িক পত্র নিয়ে কোন কাজ করেন নি।...অথচ বাংলা (অভিন্ন বাংলা) বলতে শুধু কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলকেই বোঝাতো না। পূর্ববঙ্গ ছিল বাংলার বৃহত্তম অংশ। তাঁদের কাজ দেখে মনে হয় না যে, পূর্ববঙ্গ থেকে তৎকালে কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হত। এ পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ।" এ ছাড়া গ্রন্থকার এর দুটি উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করেছেন—১. পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটি তালিকা প্রণয়ন, এবং ২. রচনা-সংকলনের মাধ্যমে এর মূল্য নিরূপণ। এই মূল্যায়ন "সম্প্রদায়গত দিক থেকে নয় বরং শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে।"

অভিযোগটি মারাত্মক। 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মুসলমান' বা 'বাঙালীরচিত উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রের অবনমন' ইত্যাদি শীর্ষক অভিযোগের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, এই অভিযোগের পিছনে কোন কারণ সক্রিয় আছে—দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, অবহেলা, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, অজ্ঞতা বা বোঝার ভুল—কোনটা? যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পর পরলোকগমন করেন তবুও তাঁর বাংলা সাময়িক-পত্রের (১ম ভাগ) তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ঐ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দেই, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কিছু সময় আগে। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত আগে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' সম্পর্কেও এই ধারণা অল্পবিস্তর সত্য। তা ছাড়া তিনিই প্রথম 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে (৭ মার্চ ১৮৩১) 'মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র' বলে চিহ্নিত করেন। বিনয় ঘোষ মহাশয়ের পরিকল্পিত ও প্রকাশিত খণ্ডসমূহ দেখে অবশ্য মনে হয় যে তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। জানি না পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা-সংকলনপ্রকাশে পত্রিকা-সংগ্রহজনিত কোনো অসুবিধা তাঁর সামনে এসেছিল কি না। তাছাড়া শুধুমাত্র আঞ্চলিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হত কিনা—তা তাঁরা ভেবেছিলেন কি না, তাও জানি না। তবে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংকলন প্রকাশ যে অতি গুরুতর একটা প্রয়োজন, একথা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ভরসা যে, দেরিতে হলেও মুনতাসীর মামুন সে কাজে এগিয়ে এসেছেন ছয়-খণ্ডে সে কাজ সম্পাদন করার জন্য। এই প্রথম খণ্ডটি তারই ভূমিকামাত্র।

ভূমিকার মধ্যেও সংকলয়িতার একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। পূর্বসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু সরে এসে তিনি 'অসাম্প্রদায়িক' মনোভাব নিয়ে সমাজ-ইতিহাস রচনায় সমাজগঠনের ইতিহাসের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি নতুন না হলেও সংবাদপত্রের আলোচনায় এর গুরুত্ব তেমন স্বীকৃত হয় নি। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এর গুরুত্ব সবিস্তারে আলোচনা করে গ্রন্থকার ঔপনিবেশিক উৎপাদনপদ্ধতি এবং তার ফলে জমিদার, মধ্যবিত্ত ও কৃষকের যে ত্রিস্তর সমাজবিন্যাস ঘটেছিল, জমিদারদের শোষণ, ঔপনিবেশিক চাকুরিলিপ্সা এবং অধস্তন শ্রেণীর মতাদর্শের আলোকে তা আলোকিত করেছেন। এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এই গ্রন্থ সমাজেতিহাসের একটি পদ্ধতিগত গ্রন্থ হিসাবে মর্যাদামণ্ডিত হয়েছে। এই আলোচনায় তিনি অবশ্য গ্রামসির মতবাদকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায় থেকেই লেখক পত্র-পত্রিকার মূল বিষয়টিতে সংসক্ত হয়েছেন। এজন্য তিনি ১৮৪৭-১৯০৫ কালপর্বে বাংলাদেশে প্রকাশিত ২৩২টি সংবাদপত্রকে বেছে নিয়েছেন। উল্লেখ করার বিষয়, ১৮১৮ থেকে ১৯৪৭ কালপর্বের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনধিক ৭৬টি পত্রিকা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থকারের নির্দিষ্ট কালপর্বে প্রকাশিত সংবাদ ও সাময়িকপত্রের যে ২টি সারণী মুদ্রিত হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ঢাকাই ছিল এদের মুখ্য সূতিকাগার। এর পরে মুখ্য স্থান ময়মনসিংহের।

অষ্টম অধ্যায়টি দীর্ঘ (৪৮-১৩৪ পৃ)। এতে (ক ও খ বিভাগে) সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রসমূহের তালিকা ও বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে। সংবাদপত্রের তালিকায় তিনটি ইংরেজি পত্রিকা ছাড়া নয়টি নতুন পত্রিকার (যা ব্রজেন্দ্রনাথের তালিকায় নাই) উল্লেখ করেছেন। 'খ' বিভাগে এমন সাময়িকপত্রের সংখ্যা প্রায় বারো। এর অধিকাংশই অন্য সূত্র থেকে গৃহীত, সরেজমিনে দেখা নয়; কেবল 'আখবারে এসলামীয়া' এবং 'উদ্দেশ্য মহত' পত্রিকা দুটি নিয়ে গ্রন্থকার সবিস্তার আলোচনা করেছেন। মোস্তাফা নূরউল ইসলাম অবশ্য 'আখবারে এস্‌লামীয়া'র প্রকাশকাল (দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকা) জানুয়ারি ১৮১৪-এর পরিবর্তে এপ্রিল মাস বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি 'আবিষ্কার' ব্যতীত এই অংশে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে কোথাও বিস্তৃত তথ্যসংযোগের ক্ষেত্রে। যেমন পরিদর্শক, সারস্বতপত্র, গৌরব, কবিতাকুসুমাবলী, নারীশিক্ষা, বৈষয়িকতত্ত্ব, হিন্দুমুসলমান সম্মিলনী, হিন্দু-পত্রিকা, কোহিনূর পত্রিকা সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য সংযোগ করেছেন নানা উৎস থেকে সংগ্রহ করে। এ ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথের কয়েকটি ভুলও তিনি সংশোধন করেছেন—যেমন, শুভপাঠিনী ও হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকার অস্তিত্ব, সঞ্জীবনীর প্রকাশকাল, সংশোধিনীর সময়চিত্র প্রভৃতি।

এসব আলোচনার শেষে লেখক গুটিকয় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যেমন, বাংলাদেশে সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম ছিল, মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকার স্বল্পতা, সংবাদপত্র প্রকাশে জমিদার ও ধনীশ্রেণীদের ভূমিকা, যোগাযোগের অভাব প্রভৃতি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশীয় অর্থনীতি এবং তার সংবাদপত্রে প্রভাব নিয়েও সুন্দর আলোচনা রয়েছে বইটিতে। এ ছাড়া এর সম্পাদকীয় চরিত্রগুলিও খুবই নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে, যা আগে কোথাও দেখি নি।

সংবাদপত্রের অস্তিত্ব এবং কৃতিত্ব দুইই বৃহত্তর পাঠক তথা জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে থাকে। সেজন্যেই সংবাদপত্র সমাজমানসের প্রতিচ্ছবি। এখানে সাম্প্রদায়িকতা খুব একট গুরুত্ব পায় না প্রকাশের আদিতে তা সক্রিয় থাকলেও। সমস্ত বইটি পড়ে একথাই আমার মনে হয়েছে। এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী' পত্রিকা সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' যে মন্তব্য করেছিল—তা এখনো উদ্ধারযোগ্য মনে করছি—"আমরা একখানি পত্রিকা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। মুসলমানদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে দেখিলে, মুসলমান জাতির অনেকটা উপকার সম্ভাবনা। তবে আশংকা এই যে, হিন্দুগণ যেমন শিক্ষার মহিমায় জাত্যাভিমান জলাঞ্জলি দিয়া দাসত্ব শৃংখলে দিন দিন অধিকতররূপে বদ্ধ হইতেছে, মুসলমানগণ সেরূপ শিক্ষা দ্বারা বিড়ম্বিত না হন। সম্মিলনী হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ দূর করিতে থাকুন, কিন্তু জাতীয়তা পরিত্যাগ করিতে না হয় সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে।"

পশ্চিমবঙ্গের টাকাকে সর্বত্র রূপি বলে (কিন্তু ৬০ পৃষ্ঠায় টাকাই রয়ে

গেছে) উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গীয় চরিত্রটি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার, যাতে বাংলাদেশের 'টাকা'র সঙ্গে গুলিয়ে না যায়। এ ছাড়া কয়েকটি পত্রিকার আলোকপ্রতিলিপিও বইটিতে সংযোগ করেছেন—এদের মধ্যে কয়েকটি নতুন। এর জন্য গ্রন্থকার অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। যে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থকার মুনতাসীর মামুন তাঁর ভূমিকা-খণ্ড রচনা করেছেন—পরবর্তী সংকলন-খণ্ডগুলিতে সেই দৃষ্টিভঙ্গির ক্রম-প্রসার্যমান চরিত্রটির সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পরিচয় ঘটবে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

বারিদবরণ ঘোষ

বঞ্চনা আর প্রতিরোধের কাহিনী

জলরাক্ষস। আবু বকর সিদ্দিক। মুক্তধারা, ঢাকা। তিরিশ টাকা।

ভূমিহীন দেশ। আবু বকর সিদ্দিক। হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা। তিরিশ টাকা।

মাস ছয়েক পূর্বে প্রকাশিত একটি উপন্যাস, একটি গল্পসংকলন। লেখক আবুবকর সিদ্দিক। এই মুহূর্তের বাংলাদেশী কথাসাহিত্যের চেহারাটা কেমন, তা বইদুখানি পড়লে অনুধাবন করা যায়।

'জলরাক্ষস' উপন্যাসের একটা অংশ ঢাকার সাপ্তাহিক বিচিত্রার ১৯৮১ ঈদ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তার ঢাকা মেট্রোপলিটান ম্যাজিসট্রেটের কোর্টে সামারি ট্রায়ালের আসামীরূপে লেখককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অবশ্য রায়ে বেকসুর খালাস পান। এই উপন্যাসে তাহলে এমন কিছু আছে যা বাংলাদেশী সামরিক প্রশাসনকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। অবশ্য সেটাই উপন্যাসের সাফল্যের তর্কাতীত প্রমাণ নয়, হতে পারে না। তবু এ সংবাদটা জানলে পাঠকের সামান্য সুবিধা হয়। উপন্যাসের দেশকাল এবং লেখকের মানসিকতাকে অনুধাবন করতে একটু সাহায্য হয়।

আবুবকর সিদ্দিক এই উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। নিচুতলার গরিব মানুষকে নির্মম প্রকৃতি যেমন মারে, নিষ্ঠুর প্রশাসনও তেমন মারে। যে প্রলয়ংকর বন্যা-ঝড় গ্রামীণ বাংলাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারই আবর্তে বন্দী এক গরিব দম্পতির বাঁচবার অসামান্য লড়াইয়ের ছবি এখানে পাই। শুধু ছবি নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। গোনজোর-আলি আর তার বিবি জরিন কী অসীম সাহসে সাইক্লোন আর বানের মোকাবিলা করে, তা এ উপন্যাসে গভীর রেখায় আঁকা। খুলনা-বাগেরহাটের নিম্নাঞ্চলের নিসর্গ আর গ্রামদেশ এখানে স্পষ্ট। সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষার নিপুণ ব্যবহারে ছবি হয়ে উঠেছে স্পষ্টতর। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র তীক্ষ্ম সমাজবোধ।

অল্প নমুনায় তার পরিচয় পাই।—

"ভয় কাকে বলে তা তো ঠিক জানা নেই। তবে উদ্বেগের বোধ আছে। বাঁচার উদ্বেগ। দেহটুকু বাঁচিয়ে রাখা হরহামেশা তাড়না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শত কিসিমের বিপদ আর কষ্টের সংগে চোখ লাল করা লড়াই। গরিবের দুঃখের কি শেষ আছে? মানুষ মারে নসীবে, মরে বাতাসে, পানিতে মারে, নিজের শরীরেও মারে। মারের চাপ যত বাড়ে, ততো বেশি বাঁচার জন্যে মুখিয়ে ওঠে গোনজোরালি।" (পৃ ২৩-২৪)

গোনজোরালির এই লড়াইটাই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য।

ঝোড়ো বাতাস, ঝাপসা বৃষ্টি, গাঢ় আঁধার, বাজ আর বিজলির হানা—এরই মধ্য দিয়ে গোনজোরালি ছুটে চলেছে। নিজেকে বাঁচাতে, বিবি জরিনকে বাঁচাতে। চৌধুরীদের লাথি-চড়ভাত খেয়ে সে বাঁচে। আজ প্রলয়ের মুখে তার সব গেছে। তার ঘরের মুলীবাঁশের বেড়া উড়ে উদোম হয়ে গেছে, চালা নেমে এসেছে কাঁধের ওপরে। তবু সে হার মানবে না। আশ্রয়হারা গোনজোরালি-জরিন তুফানের সঙ্গে লড়াই করে ডিঙি নিয়ে খুঁজে বেড়ায় আশ্রয় আর খাদ্য। খাদ্যের সন্ধানে জরিন যায় রিলিফ অফিসারের কাছে। অফিসারের লালসার শিকার হয় জরিন। মনের সুখে তাকে ধর্ষণ করে অফিসার। মন্ত্রী থেকে শুরু করে ইউনিয়ন কাউনসিল চেয়ারম্যান—সবাই গরিবকে মারে, রিলিফের নামে লুটেপুটে খায়। আর ভুঁড়েল রিলিফ অফিসার জরিনকে লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করে। তার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে জরিন আর গোনজোরালি নদীপথে নৌকায় চলে। নরপশু মিলিটারির কবল থেকে যদি-বা পালাতে পারে, নির্মম সাইক্লোনের হাত থেকে পালাতে পারে না। সাড়ে পাঁচহাত তুফানের ক্রুদ্ধ আক্রমণ। উড়ে যায় জরিন, গোনজোরালি আর তাদের মরা ছেলে।

নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক ভয়ংকর আর বীভৎস উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। উন্মত্ত তুফানের মতোই তাঁর ক্ষমাহীন চাবুক চালিয়েছেন। অন্যায়কারী প্রশাসন আর লম্পট সরকারি কর্মচারীদের উপর। তার চেয়ে বড়ো কথা, সাহস আর তেজ নিয়ে বাংলাদেশের গরিব-গুরবোদের দুঃখ আর লড়াই করার মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাস মাঝে-মাঝে কর্কশ আর অশ্লীল মনে হতে পারে আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতার কাছে। সন্দেহ নেই, আমাদের মধ্যবিত্তসুলভ সৌন্দর্যবোধ তাঁর রচনায় আহত এবং ক্রুদ্ধ হয়, যেমন হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা পড়ে। তাই বলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি না, এই লেখককেও পারি না।

'ভূমিহীন দেশ' সাতটি গল্পের সংকলন। পূর্ববর্তী উপন্যাসে যে মানসিকতা সক্রিয়, তা এখানেও উপস্থিত। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের গরিবগুরবোর দুঃখ-কষ্ট আর মোহভঙ্গের সাতটি তীক্ষ্ম গল্প এখানে পাই। আজাদি গরিবের মাথার উপর চালা, পেটের ভাত আর পরনের কাপড়ের নিশ্চয়তা দেয় নি। এই কঠোর নির্মম বাস্তব ভারতের পক্ষে যেমন সত্য, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে তেমনি সত্য। সেই সত্যের সঙ্গে এই সংকলনে যুক্ত হয়েছে গরিব মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা, লড়াইয়ের এষণা। সচ্ছল ধনী আর উচ্চাশী মধ্যবিত্ত ভোটের লড়াইয়ে যখন নামে তখন ডাক পড়ে গরিবের, কারণ সকলেরই আছে একটি করে ভোট। গরিব মানুষ তাতেই খুশি, ভাবে ভোট দিলেই পাবে জমি, আশ্রয়, অন্ন। কিন্তু সে কেবল প্রতারণা।

লেছার আর মালিহা (ভূমিহীন দেশ), বেলুনওয়ালা (বেলুনওয়ালা), ল্যাকা, ওমেদালী (খালখসা লাল কংকাল), তরফদার (ভূতপ্যাঁদানী), শরীফ মিয়া, গ্রামের গরিবগুরবো (খাদ্যমন্ত্রণালয় কতো দূর), প্রভু, আসাদ, বিনতা, পাপিয়া, আলী সাহেব (মানুষে থেকে দূরে), বেলাতালী, রুণী (চন্দনের ঘুণ)—এইসব চরিত্র উঠে আসে মাটি থেকে। অবশ্য শেষদুটিতে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষকেই পাই। গরিব আর নিম্নমধ্যবিত্তের ভাগ্য ফেরে নি। যতই আজাদি আর সুখের কথা বলা হোক না কেন, সবই শেষমেষ ঝুটা। এই বোধটা সব গল্পেই ঠেলে উঠেছে। গরিবকে ঠকায় ধনীরা, নিম্নমধ্যবিত্তকেও ঠকায়। তবু গরিবরা মাঝে-মাঝেই লড়াই করে, মধ্যবিত্তরা তাও পারে না, যেমন পারে নি বি-স্যার ওরফে অধ্যাপক বেলাতালী, যে মিডল ঈস্টে দশ হাজার টাকার চাকরি নিয়ে চলে যেতে উদ্যত। কেবল কলেজে বিদায়-অনুষ্ঠানে জানাতে পারে না যে সুইপারের চাকরি নিয়ে সে চলে যাচ্ছে ('চন্দনের ঘুণ')। গ্রামের গরিবরা ভোটপ্রার্থী মৃধা শাহেবের মুখের ওপর বলে—'ওয়াদা এ পর্যন্ত কেউ কোনোডা রাখে নি হুজুর। খালি ওয়াদার পর ওয়াদা। জমে জমে অ্যাই পাহাড়। এ্যাকটাও পারে নি। উলটে খালি দাম বাড়িছে। অভাব বাড়িছে। ভোট দেলাম আলা দেলাম চেয়ার দেলাম —তবু বাঁচার লাগালডা পালাম না।' (পৃ ৪৭, 'খালখসা লাল কংকাল')

বিদ্রূপে ঘৃণায় ক্রোধে যন্ত্রণায় মহীয়ান হয়ে ওঠে গরিবরা, ফিরিয়ে দেয় শহরের ভোটপ্রার্থীকে। কখনো বা প্রতিবাদ সরব হয়ে ওঠে, মুষ্টিবদ্ধ হয়, তাড়া করে শহরের ভোটপ্রার্থীকে, ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দেয় শরীফ মিয়ার গাড়ি, আর উলঙ্গ মিয়া সাহেব দৌড়ে পালাতে চায় ('খাদ্যমন্ত্রণালয় কতো দূর')। আবার কখনো-বা আশ্রয়হীন হয়ে গরিব কাঁদে, কান্নাই তার সম্বল, আর কিছু নেই ('ভূমিহীন দেশ')। কখনো-বা গরিবের উপকারার্থী চলে স্বপ্নের দেশে—তাকে জানতে হয় সুখের স্বপ্ন গরিবের কাছে বিক্রি করা যায় না ('বেলুনওয়ালা')। আর আমরা মুখোমুখি হই এক কঠিন বাস্তবের,—গরিবের নসীবের বদল হয় না।

খুলনার উপভাষা এখানেও ব্যবহৃত। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখায় লেখকের যথেষ্ট আগ্রহ। তবে কেন তিনি লেখেন, 'এ্যাই এ্যাকটা; লিখলেই পারেন—'অ্যাই অ্যাকটা'।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

তিন ভুবনের তিনটি চোখ

দক্ষিণায়নের দিন—শওকত আলী। মুক্তধারা। ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। বাংলাদেশ। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

অপলাপ—মাহবুব তালুকদার। মুক্তধারা। ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। বাংলাদেশ। বত্রিশ টাকা।

চর আতরজান—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন। মুক্তধারা। ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। বাংলাদেশ। বাইশ টাকা।

"...মনে হয় কেউ যেন আছে। আছে একটি অপরিচিত মানুষ—যার দীর্ঘ দেহ সে মনের ভেতর দেখতে পায়, যে আছে আবছা ছায়ার আড়ালে। যার হাত দেখতে পায়, পা দেখতে পায়—দূর থেকে দেখা কুয়াশার মধ্যে একটা শিলুয়েটের মতো ছায়াও দেখা যায়, মুখটা দেখা যায় না ('দক্ষিণায়নের দিন')। একটি মানুষের খোঁজে আরেকটি মানুষের এই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন আবহমান কালের গবেষণা। একজন তার হাত বাড়িয়ে দেয়, কাউকে ছোঁবে। চোখ আকাশে তোলে—'আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ

হয়ে উঠল ফ্রটি।' এক পা হাঁটা দেয়, কোনো এক জায়গায় পেঁাছে যেতে চায় সে। মানুষের এই হাঁটা এই দেখার কোনো শেষ নেই, চরৈবেতি। উপন্যাসের বিষয় সেই সুরে গাঁথা।

ঝকঝকে ছাপা ১৫০ পৃষ্ঠার উপন্যাসে এই মানুষেরই সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকটি মুখ, আরো একদল মানুষ।—'আকাশে ইতস্তত মেঘ ছিলো। দুপুরবেলা হঠাৎ মেঘের ডাক শোনা গেল। রাখী হাঁটছিল—" এই কটি কথা দিয়ে শুরু হয়েছে যে বেদনাপর্ব, তার পাশাপাশি হেঁটেছেন লেখক শওকত আলী। প্রেম, ভালোবাসা, দৈন্য, অভাব, উচ্ছৃংখলতা, দুঃখ, রাজনীতি, ধর্মবোধের পাশাপাশি কখনো-সখনো কপালবাদী দর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ট্রিলজি উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'দক্ষিণায়নের দিন'-এর পাতায় পাতায়। নিটোল গদ্যের ঝরঝরে বুনোটে ঠাসা, চমৎকার কথাবার্তায় লেখক অনায়াসেই পাঠককে মজিয়ে দিতে পারেন। লৌকিকতা-অলৌকিকতায় তাঁর ভাষা পদ্মের মতো একে একে ছুটতে থাকে, এগোতে থাকে উপন্যাস।

সুস্থ পরিচ্ছন্নতার আওতায় বড়ো হয়েছে রাখী। বোন বুলু ভালোবাসার টানে ভেসে গিয়েছিল, জিততে পারে নি। মানুষ চেনায় ফাঁকি ছিল। বাংলাদেশী বনেদি মুসলমান কালচারের ঠমকগমক ছাঁকা পরিষ্কার দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়েছিল আব্বাজান রাসেদের জীবনযাপনে। য়ুনিভার্সিটির ব্রিলিয়ানট স্কলার রাখী একবার তাকায় প্রেমিক অসহায় অধ্যাপক জামান সাহেবের দিকে। পরমুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় শীর্ণ সেই মুখ, সেই আদল, দেশের মুক্তির নেশায় যে পুরুষ পথে-পথে ক্লান্ত পায়ে সংগঠন গড়ে সেই সেজানের হাত পা অবয়ব। বুঝতে পারে না রাখী—কে, কাকে ভালোবাসে। কেন ভালোবাসে!

গল্পের বাহাদুরি তেমন নেই যা আছে ফিলসফির অপারেশন। মন আর মননের সূক্ষ্ম কাজ, দেহতত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ। ইতিহাসের হালকা পরদায় ঢ়িলে হাতে টান, আর্থনীতিক সমাজব্যবস্থায় সীমিত উচ্চারণ। ন্যায় সততা বনাম অন্যায়ের যুদ্ধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বুলু আর তার অর্থকামুক স্বামী হাসানের দাম্পত্য বিঘ্নতার ফাঁকফোকরে। নন্দনতাত্ত্বিক প্রেমের সাবেকি ডেফিনেশানকে আঁকড়ে ধরে রাখী চেষ্টা করেছে পবিত্র জীবনযাপনের। বিয়ে করেছে আজানকে। সে বড়ো একা। তার কেউ নেই। লোভের হাতছানি। কোমপানির বস মোতাহারের অলস ডাক তাকে টলাতে পারে নি। "জীবন কেবল হাতছানি দেয়। দান করে না কিছুই। ক্ষোভ বলো, দুঃখ বলো, কোনো ব্যাপারেই জীবনের কিছুই দেবার নেই। ভাবনা যাই হোক, ইচ্ছে যাই হোক, জীবন তার নিজের নিয়মমতে চলে—" "জীবন বড়ো মোহিনী, বড়ো ছলনা তার—"। এইভাবেই রাখীর জীবনযাপন, বিয়ে, রাশেদের ঘর-গেরস্থ।

কখনো রাখী বিচিত্র হাসি হাসে। বিপ্লবী সেজান যার ঘর নেই, বাড়ি নেই, নিজের বলতে কেউ নেই, অসুস্থ কর্মীর শরীরে যে ঢেলে দেয় নিজের মূল্যবান রক্ত, যার কুলিশকঠোর বৈরাগ্যকে স্বাদেশিকতা শাসন করে, তারও মাঝে-মাঝে কাউকে পেতে ইচ্ছে করে। একটি নিঃসম্বল মানুষের আরেকটি মানুষের প্রতি বিপন্নতাবোধ উপন্যাসটিকে মহত্তর করেছে। চিরকালীন করেছে। মানবিক করেছে।

তথাপি অনুযোগ রয়ে যায় কোথাও-কোথাও। ভালোবাসাবাসি, ঘর-বিছানা, বুকর‍্যাকে হেমিংওয়ে থেকে শামসুর রাহমানের বই, আসবাবের পাশাপাশি বা ধাক্কায় আসল জীবনের কথা যেন চাপা পড়ে গেছে। "বিশ্বাস বলে কোন বস্তু আমার মধ্যে নেই, আমি ভীষণ রকম শূন্য" মৃতছেলে মনির কথা। "সুখি না হলে অমন করে সাজে কেউ, অমন করে বরের পাশে বসতে পারে" কিংবা সময় শুধুই হতাশা পরাজয় আর মৃত্যু"—"সময় শুধুই গ্রাস করে নেয় সবকিছু।" এ তাবৎ কনসেপ্ট উপন্যাসের থিম, ফিলসফিক্যাল ওরিয়েনটেসনের সঙ্গে খাপ খায় না। বরং কিছুটা বেমানান।

স্মৃতিস্মরণ দিয়ে প্রস্তাবনা টেনেছেন মাহবুব তালুকদার। উপন্যাসটির উপসংহারে মূলচিত্র শরীফুল হকের প্রতি বেদনগাথা গাওয়া হয়েছে। মোট ১৩টি অংশে টুকরো-টুকরো কথোপকথন, মনোলগের কায়দাকানুন, কাহিনীর ব্যবহারে তালুকদার সাহেবের উপন্যাস 'অপলাপ' কোনো মতে পাঠযোগ্য করে নিতে বেশ কষ্ট করতে হয়। ভাষার সাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে সর্বাত্মক প্রশংসা তিনি কখনোই দাবি করতে পারেন না। কাহিনীটুকুর যা রস,সেটুকু বাদ দিলে এককথায় শূন্যকুম্ভ বলা যায়।

চাকরি ছিল না শরীফুলের, দাম্পত্যে তৃপ্ত ছিল না আজাহার, নাহারের সময় দুষিত হয়ে উঠেছিল আজমের নোংরা স্পর্শে। এভাবেই জীবন মানুষকে অসুখী করে তোলে। দাম্পত্যে বিঘ্ন, নাহারের জীবনযাপনে হাতেম আলীর অনুপ্রবেশ, নজরবন্দী নাহার সুন্দরী নাহারের কাছে-কাছে থেকে স্বামীর অভিনয় করে যেতে হবে শরীফকে দাবি করতে পাবে না কখনো —এই শর্তে চাকরি,—এইসব নিয়েই উপন্যাসের গোড়াপত্তন।

উপমার ব্যঞ্জনা, ফিলসফির যাওয়া-আসা, চরিত্রচিত্রনের ক্ষমতায় লেখক দ্রুত এগোতে চেষ্টা করেছেন। সাধুবাদ জানাবে পাঠক। ঘটনার টান-টান অনুভূতি, কিভাবে সত্যের অপলাপ হল তারই রহস্য নির্ণয়ে আগ্রহও হয়তো বাড়বে। তবে সাহিত্যিক মুন্সিয়ানার মাপজোপ নিখুঁত বলা যায় না। গদ্য কোথাও কোথাও আটকে যায়, থমকে পড়ে। তারপর আবার এগিয়ে যাওয়া—, খানিকটা ধিকিধিকি ঝলকে উঠে আসে, ফুটন্ত আঁচের পরিবর্তে।

"জীবনের যদি কোন অর্থ থাকে তবে তা ভোগের নামান্তর । সে ভোগ যাই হোক না কেন—অর্থ, নারী কিংবা অন্য কিছু" কিংবা "প্রতিভাবানদের সঙ্গে সর্বদাই এক অদ্ভুত আত্মীয়তাবোধ করে বলা—" অথবা "হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই বলে ভয় আরও বেশি"—এ ধরনের রিয়ালিস্টিক ইনটারপ্রিটেশন উপন্যাসটির একমাত্র পজিটিভ সাইড। সেক্সুয়াল ইগো বেশ দৃঢ়ভাবেই কোনো-কোনো চরিত্রকে আধুনিক করেছে। অনায়াসে তিনি বলতে পেরেছেন "জন্মানোটাই তো আকস্মিক ব্যাপার, আকস্মিকতা একটা মানুষের চূড়ান্ত পরিচয় হতে পারে না।" পারভেজ উপন্যাসের অন্যান্য লোকজনের পাশাপাশি থেকেও বেশ ভিন্ন।

মানুষ জানে কে তার বন্ধু, কার জন্য কে অপেক্ষা করে থাকে। নাহার শরীফকে অনুভব করে ব্যক্তিগত দুঃখ-দৈন্য-হতাশার ভেতর দিয়ে। ইতস্ততায় কেঁপে ওঠে শরীফ। ঝড় আসে, মৃত্যু আসে তারপরের জীবনযাপন স্বাভাবিক। সবাই সব ভুলে যায়, নিজেদের নিয়ে মেতে থাকে। ঘর সংসার, সন্তান বেড়ে ওঠে শরীফের শরীরের বেদিতে পা রেখে। ফাঁসির পর তার দেহ মাটির নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অজানা পর্যটক দেখতে আসে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে। সত্যের অপলাপের পাশাপাশি দেওয়াল তোলে সাজানো গল্পের জৌলুসধারী আরেক অপলাপ।

মনীশির্যানার চরম উৎকর্ষে উত্তরে গেছে উপন্যাস 'চর আতরজান' অসাধারণ রচনাশৈলী, মানুষ চরিত্রের রহস্য, অলৌকিক দেহ, তার খিদে-জ্বালা-প্রেম সবে মিলে লেখাটি মহত্তম। গদ্যের শরীরী গঠনে, ইতস্তত গল্পের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রাম আর গ্রামের মানুষেরা। গার্হস্থ্য জীবনের তীক্ষ্ম শ্লেষ, পরিণত বিষাদ, বিবেকের কামড়, লোভের চোখ, ভালোবাসার জোয়ার-ভাটায় কিশোরী থেকে কবে কবে যুবতী হয়ে যায় নামভূমিকায় মেয়েটি —আতরজান। তা সে নিজেও জানে না।

১২টি অংশে ভাগ করা হয়েছে বিষয়বস্তু। ঝকঝকে ১০৩টি পৃষ্ঠা রচনাগর্বে একটি আরেকটির চেয়ে উজ্জ্বল। লেখক আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন তার জাত-কলমের আঁচড়ে যে কটি চরিত্রের জন্ম দিয়েছেন তারা আবহমান বাঙলা আর বাঙালিকে রিপ্রেজেনট করে। তিনি সফল, শক্তিমান—বলা বাহুল্য।

"—কেটে শেষ করতে হবে ধানের বোঁটা শুকোবার আগে। বেশি শুকিয়ে গেলে কাঁচির আঘাতে ঝরে যায় অর্ধেক। আরো ঝরে ভারের দু'প্রান্তে দু'বোঝা বেঁধে ক্ষেত থেকে আনবার সময় দুলুনি খেয়ে। বোঝার ভারে বেঁকে যায় বরাক বাঁশের বাঁক। বেঁকে যায় বাদলাদের ঘাড়।—ধুলো আর ধানের হুংয়ে শরীর ঢাকা পড়ে বাদলাদের" চর আতরজান। এমন সার্থক গ্রাম খুব কম বাংলা উপন্যাসেই চোখে পড়ে। কলম নয়, যেন ফোটোগ্রাফিক চোখ—নিখুঁত, হুবহু, জীবন্ত।

উপমা পাঠককে অবাক করে, তৃপ্ত দেয় "ব্যাঙের পোনার মত" সন্তানেরা, "সিঁদুরে আমের রং মেয়ের ডিমেল মুখে", "ধোড়া সাপের মতো কোমর মোড়ায় আতরজান", "মাছুয়াদের দাপাদাপিতে দীঘির স্বচ্ছ পানি দৈ দৈ হয়ে গেল।" কিংবা "বাইরে যম অন্ধকার"। সাবেকি শব্দের ব্যবহার থেকে পিছিয়ে এসে নতুন যে মোড় তিনি আনতে পেরেছেন তাকে সাধুবাদ জানাতে পাঠকের কোনো কুণ্ঠা নেই।

বারে বারে সাদি করে গেছে মাতব্বর, নারীর নরম মাংসে সে যে মেয়েছেলেকে আবিষ্কার করে তাঁরা ভাতমুড়ির মতোই খাদ্যবিশেষ। শরীরের বর্ণনায়, চাহিদায়, চেতনায় প্রেমিক তাজু মিঞা আবার ভিন্ন শিবিরের লোক। ছোটো থেকে কুড়িয়ে এনে, বড়ো করে, পুষ্ট করে 'আতরী'কে সাদি করে বুড়ো-হাবড়া মাতব্বর। বৃদ্ধ বয়সে নতুন বউয়ের জল পেয়ে যৌবন ফিরে পায় সে। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। অসহায় তাজু সুদিনের অপেক্ষা করে। রাতের অন্ধকারে পরের বউকে জড়িয়ে ধরে বলে 'আতু, আমার আতু'। তখন আকাশে মহারাত্রি।

আতরীর সুখ, সাদ স্পন্দন সবই ভেসে যায় মাতব্বরের আগ্রাসী মুখের তোড়ে। টোটকা আর কুসংস্কারে মেজ বিবি তারাবানুর নিগ্রহ, বোহেমিয়ান পুত্র মামুদ যাত্রাপার্টিতে ঘুরেফিরে জীবনের নতুন সাদ পায়—এসবেরই মাঝে এগোতে থাকে গেদুর সম্পদ-সম্পত্তি। লোক ঠকিয়ে, অন্যায়ের সাথে রফা করে তার আমৃত্যু হালচাল। যখন যাকে বিয়ে করে যতদিন যৌবন ততদিন তার কদর। সোনা গড়িয়ে দেয়, চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দেয় 'সোন্দর গতরটি'।

আতরজানের গতরে মাংস বেড়ে ওঠার সাথে-সাথে গেদুর মামলায় জিত হয়। পয়মন্ত আতরকে শেষ বয়সে সাদি করে গেদু। তখন তার পৌরুষ বিকল হয়ে গেছে। রূপোকথার মতোই নদীর জলে জেগে উঠেছে চর। বুড়োর নতুন বিবি আতরের নামেই রাখা হয় চরের নাম—চর আতরজান। এ সম্পদ সম্পত্তি আতরেরই প্রেম-উপহার—সোহাগ উপলে ওঠে মাতব্বরের। তার মনে হয় "জোয়ান নারীর মুখের লালা সব চাইতে বড়ো সালসা।" তার হৃত যৌবন উদ্ধার পাবে। অসহায় আতর তার মনের মানুষ তাজুর কাছে নিজেকে উজাড় করে দেয়। বলে, 'আমার আর ভালা কিসের—মাতব্বরের ফেন পানি খাইয়া বড় হইছি। ছের বাড়ির বান্দিদাসী

দাসী আমার আবার রাজী অরাজী কি'?

উপন্যাসের শেষাংশে লেখক ভীষণ রিয়্যালিসটিক। সারা জীবন যে আতর-জান শোষণ আর নিপীড়নের মধ্য দিয়ে বড়ো হয়েছে জীবনের বিপর্যয়ের পর ক্ষমতা পেয়ে সেও শাসক হয়ে ওঠে। উবে যায় প্রেম। সরে যায় স্বপ্ন। সুখের স্বাদ তাকে পাথর করে দেয়, কঠিন করে দেয়।

সুপারফিসিয়ল হিউমেন ড্রামার যে জীবনভেদী চিৎকার মহতী উপন্যাস-গুলোতে ধ্বনিত হয়, এই উপন্যাসেও পরিষ্কার শোনা যায় সেই ডাক। কে ডাকে, কারা যেন ডাকে। ভালোবাসা-বাসি-খেলা চলে বিশ্ব চরাচরে। মুসলেহউদ্দিন সাহেবের বিশ্লেষণী চোখ, দার্শনিক মনন, মানুষের পাশে বেঁচেবর্তে থাকার মানসিক কৌশল সব মিলেমিশে যে এপিক তৈরি করেছে সাহিত্যের উঠোনে তার কদর চিরকাল থাকবে।

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

অন্য জীবন, গল্পের ভিন্ন রীতি

জীবন ঘষে আগুন। আজিজুল হক। মুক্তধারা, ঢাকা। ষোল টাকা।

পাতালে হাসপাতালে। আজিজুল হক। মুক্তধারা, ঢাকা। কুড়ি টাকা।

যুবরাজ। হাসামত আবদুল হাই। মুক্তধারা, ঢাকা। ষোল টাকা।

সাহিত্যের পালাবদল স্বাভাবিক ঘটনা। বাঙলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও পালা-বদল ঘটেছে বারে-বারেই। এই পালা-বদল ঘটলেও ঐতিহ্যের শাসন কিন্তু মানতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে বিমল কর—গল্পবলার এই পরিবর্তন লক্ষ করি। এই পরিবর্তন আসে সমাজমনস্কতা থেকে। আধার এবং আধেয় দুই-ই সমাজের টানাপোড়েনে পালটে যায়। আমাদের গল্পে বিগত তিরিশ বছর ধরে এই পরিবর্তনের ঢেউটা যেন বেশি তীব্র, গল্পকাররা বেশি অস্থির। বাঙলা ছোটোগল্পে এল অ্যানটি-স্টোরির প্রবণতা। অ্যানটি-হিরোর জন্মও এই পথে। বিষয়ের পরিবর্তনও ঘটছিল সেই সরণি ধরে। বিচ্ছিন্নতাবোধের বিস্তারও ঘটতে থাকে সেই সূত্র ধরে। আবার স্বাধীনতার পরে আমলাতন্ত্রের টানটোনগুলি যখন কেটে বসছিল জন-চিত্তে—তখন যে অসন্তোষ, বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল ছোটোগল্প তাকেও গ্রহণ করেছিল অনিবার্যভাবেই। বাংলাদেশের গল্পকার আজিজুল হকও আধার এবং আধেয়কে নূতন দিকে ঘুরিয়ে দেন। আজিজুল ঐতিহ্য থেকে সরে যান না অবশ্যই। কেননা তিনি জানেন সরে যাওয়ার মানেই স্বখাতসলিলে ডুবে মরা।

তৃতীয় দুনিয়ার সমস্যার বিশেষ একটা রূপ আছে। বাঙলা ছোটোগল্পে সেইসব সমস্যার বিস্তার। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে মুক্ত হবার পর তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশই নূতন অধীনতার বেড়ি পড়েছে। মুক্তিকামী মানুষ ধীরে-ধীরে বুঝতে পারল, তাদের সামনে আর-এক কঠিন নাগপাশ। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমলা-তন্ত্রের বহুরূপী প্রকাশ এবং মুখোশের অন্তরালে নির্লজ্জ পাশবিকতা সাধারণ মানুষকে চমকে দিল। বিহ্বল মধ্য-যুগীয় বিশ্বাসে সেই পাশবিকতাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অথবা আল্লার কেরামতি বলে গ্রহণ করতে রাজি নয়। সাধারণ মানুষ ব্যবহৃত হতে-হতে একদিন নিজের দিকেই তাকায়, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়, সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগ্রামী হয়ে উঠতে চায়। আজি-জুলের গল্পে তার ইশারা-ইঙ্গিতই নয়, সরব রূপের প্রকাশ। যেমন, হাঁপানি-রোগী কবিরাজ নিশানাথের মৃত্যুপথে যাত্রার কাহিনী। এই মৃত্যু-দৃশ্যটিকে কেন্দ্র করে আজিজুল নিশা-নাথের অতীতকে চকিত করেন। গ্রামীণ মানুষের নিশানাথের রোগ-বৃত্তান্ত এবং নিরাময় হবার উপায় সম্বন্ধে নানা গল্প রবীন্দ্রনাথের নাট-কের জগৎদুশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজিজুল এরই মধ্যে নিরন্ন মানুষগুলির দীর্ঘশ্বাসকে বিস্তৃত করে দিতে থাকেন। জন্ম-মৃত্যুর গতানু-গতিকতায় নিশানাথের সংসার কিন্তু একই রকম ভাবে চলে। নিশানাথের ছেলের বাপের মরণের চাইতে বড়ো ব্যাপার হল সুধা। সে মেটে আলুর সন্ধানে চলে যায়। "মেটে আলু অবশ্যি এখন সবাই ভাতের বদলেই খাচ্ছে।" আর আজিজুল লক্ষ করেন, সেই আলু ছেলের কপালে জোটে না। কেননা, দারোগালি চুরির দায়ে ছেলেকে পেটাতে থাকে। গল্পের শুরু হয়ে-ছিল দুটি ষাঁড়ের লড়াইয়ে। নিরুপদ্রব গ্রামীণ জীবনে অন্য গ্রাম থেকে একটি ষাঁড় এসে গ্রামের ষাঁড়টিকে আক্রমণ করে। মানিক এবং অবলা এই ষাঁড়ের লড়াইয়ের উত্থানপতন লেখক বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করেন (শোণিতসেতু)। গ্রামের ষাঁড় অবলা হেলে যেতে-যেতে রুখে দাঁড়ায়। গ্রামের মানুষেরা নিশা-নাথের ঘরেই এই বিচিত্র ষাঁড়ের লড়াই-য়ের কথা বলে। তারা উত্তেজিত, আলোড়িত। আজিজুলের টুকরো মন্তব্য "শাণ থেকে উত্তেজনা নিষ্কা-শিত হতে থাকে।" এই উত্তেজনার প্রতি লেখকের প্রীতিপক্ষপাত। আরও একটি বৃত্তান্ত এই কাহিনীতে আজি-জুল জুড়ে দেন। গ্রামের মানুষেরা জানতে পারে শহরের একজন তাদের পাকা ধান কেটে নিয়ে যাবে। সেখানেও উত্তেজনা। নিশানাথের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই, অবলার বিদেশী গোরুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আর তার সঙ্গে কাঁপতে থাকে চাষি মানুষের উত্তেজনা। এই তিনের সমন্বয়ে গল্পটি পরিণামমুখী হতে থাকে। নিশানাথের বউয়ের জেদি নাকও ফুঁসতে থাকে নিষ্পেষণের পক্ষ-প্রতিপক্ষের শক্তি এইরকম, "মানিক যে অত্যন্ত বলশালী তাতেও সন্দেহ কিন্তু তার রং, সরু সরু পা, ছোটখাটো চমৎকার পরিষ্কার খুর ইত্যাদি তার আয়েশি প্রকৃতির কথাই বলে। অন্য-দিকে সবলার কদাকার হাভাতে চেহারা—বিশ্রী ময়লা রং, সুষমাহীন আকার, ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া খুর তার অত্যন্ত রুঠো মেজাজ আর দুঃসাহসী স্বভাবেরই ইঙ্গিত দেয়।" শোষক আর শোষিতের এই চেহারাটা স্পষ্ট হয় এইখানে। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পেও সম্পত্তি-বান আর সম্পত্তিহীনের মুখোমুখি হবার দৃশ্য দেখতে পাই। ঘন্টাবাবু-মনোহর-মন্তাজের এককোটিতে লালসা ঘৃণা, অন্য কোটিতে বেদনা আর ভালোবাসা। কালীকে টাকা দিয়ে যখন ঘন্টাবাবু কালীর বাড়িতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল তখন ঘন্টাবাবু টের পাচ্ছিল, "মেয়েটি আদৌ হাসে না আর তার কথা পাথরে ইস্পাত ঘষার মতো, আগুন ঝলকিয়ে ওঠে এবং কখনো বিকট হাস্য উদ্গতপ্রায়, প্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন অথচ এই-সবের পিছনে একখণ্ড শ্রাবণ আকাশের বর্ষণমুখী মেঘ।" মেলায় যাবার মুখে বাগদীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মনোহরের ঘন্টাবাবুকে খুন করা, দেবীর রক্ত-পিপাসা আজিজুলের ভাষায় ছুরির মতো তীক্ষ্ন। তাঁর ভাষা ব্যথায় কখনো ভারাক্রান্ত, কখনো বিদ্রূপকঠিন।

দুটি গল্পের বিষয়ই এমন কিছু অভিনব নয়। মন্বন্তরে আমরা মরি নি একথা কে বলবে? শোষণ-অনাহার-নির্যাতনের কাহিনী বাঙলা ভাষায় কিছু কম নয়। এর অধিকাংশ গল্পই তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় রচিত। আজি-জুলের গল্পেও সেইসব কথার বিস্তার। তিনিও বাংলাদেশের এই ক্ষয়কে লক্ষ করেছেন। কিন্তু সমাজের বাস্তবতাকে আজিজুল এত সহজে বোঝেন না। তিনি খুঁজে পেতে চান তলাকার ঘূর্ণিকে। যে ঘূর্ণির বলয়ে মানুষের ক্ষোভ অসহায়তা পাক খায়। আর তার থেকেই নির্গত হয় বজ্রকঠিন মরণ-সংকেত। আজিজুল কমলকুমার মজুম-দারের গল্পকথনরীতি গ্রহণ করেছেন 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পে। কিছুদিন আগেও মনে হয়েছিল, কমলকুমার বাঙলার ছোটোগল্পে-উপন্যাসে যে দ্বীপ রচনা করেছেন, সে দ্বীপে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অন্যের প্রবেশ-অধিকার নেই। আজিজুল সে দ্বীপের বাসিন্দা হতে চান নি কিন্তু দ্বীপের সৌন্দর্য তাঁকে আকর্ষণ করে। এমন কি প্রথম গল্পে অবলা-মানিক দুই ষাঁড়ের অবতারণা এবং তাদের মাঝে-মাঝে লড়াইয়ের বর্ণনা কমলকুমারকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর জীবন ঘষে আগুনে মেলার হাতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা বোধ করি সেই সূত্র থেকেই এসে যায়। কমলকুমারের রচনায় রূপ-কথা-ব্রতকথারীতি মিলেমিশে যায়। আজিজুলের রচনায়ও তারই ইঙ্গিত। কমলকুমারের মতোই আজিজুল চিত্র-লেখায় তৎপর। প্রকৃতির সঙ্গে মানবা-ত্মার সেতুবন্ধ রচনা করেন আজিজুল। কিন্তু কমলকুমারের সঙ্গে আজিজুলের পার্থক্যও আছে। ঠিকই তিনি তৎসম শব্দের সঙ্গে হালকা দিশী শব্দ মিশিয়ে দেন, তথাপি আজিজুল ভাষার উপর দখল নিয়েও ভাষার টানে আত্মবিস্মৃত হন না। আজিজুল কমিটেড কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর গল্পের প্যাটারনে আমরা পেয়ে যাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উপাদান। যে আগুন তিনি গল্পে বিস্তৃত করেন তাতে দগ্ধ হয়ে শুদ্ধ হয় মনোহর-নিরাসক্তির সঙ্গে জীবনবোধ মিশিয়ে দিয়ে আজিজুল সার্থক হন।

এই ব্যাপারই দেখি 'পাতালে হাস-পাতালে' গ্রন্থের গল্পগুলিতে। 'সাক্ষাৎ-কার' গল্পটিকে আধুনিক কালের অন্য-তম শ্রেষ্ঠ গল্প বলতে পারি। গল্পটি খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু নির্যাতনের পৈশাচিক দিকটি চকিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে যে মানুষটি প্রাণের আরাম চেয়েছিল তাকে ধরে নিয়ে এল জহ্লাদরা। তিন জহ্লাদের সামান্য কিছু জেরা চলল—অনেকটা নাৎসি দস্যুদের কায়দায়। এই তিনটি জহ্লাদকেই আজিজুল ভৌতিক বাতা-বরণে ঠেলে দিয়েছেন। তাদের প্রতিটি সংলাপকে আজিজুল রণিত করে তোলেন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে। সমরেশ বসুর বিখ্যাত গল্প 'স্বীকা-রোক্তি'তে জেলের বর্ণনায় যেমন গা-শিরশির-করা ভয়কে বিস্তৃত হতে দেখি, আজিজুলের গল্পও তাই। আজিজুল গল্পটিকে ঘন, রহস্যময়, কিছুটা আতঙ্কজর্জর করে তোলেন। জহ্লাদের সংলাপের বাক্যের শেষ ধ্বনিটিকে পুনরায় ব্যবহার করে নৈঃশব্দ্যের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ রচনায় আজিজুল দক্ষ। 'মধ্যরাত্রের কাব্য' গল্পে ক্ষুধা আর মৃত্যুর দৃশ্য। বনফুলের দুর্ভিক্ষসংক্রান্ত একটা গল্পে ছিল মানুষ ইঁদুর চিবিয়ে খাচ্ছে। আর আজিজুল লেখেন মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে। এই গল্পের কোনো করণকৌশল নেই। না থাক। রিপোর্টাজেও অনেক সময় রঙ ধরে গল্পের। 'সরল হিংসা'য় গল্পকার আবার স্বক্ষেত্রে চলে আসেন। 'জীবন ঘষে আগুন'-এ মনোহর খুন করেছিল ঘন্টাবাবুকে। এখানে দেখি নিরন্ন মেয়েরা ব্যবহৃত হতে-হতে জ্বলে ওঠে। পুরুষের

লোভের শিকার আর তারা হতে চায় না। তখন তারা আর মেয়ে থাকে না। জান্তব ক্রোধে ফেটে পড়ে তারা। তাদের চোখে দেখা দেয় প্রতিশোধের শপথ। এই জান্তব জিঘাংসাই হয়তো একদিন বিপ্লবের পথ তৈরি করবে। 'পাতালে হাসপাতালে' মধ্যবিত্তের মানসিকতার সঙ্গে এসেছে আমলাতন্ত্রের শিক্ষিত মানুষের উপেক্ষিত মানুষের প্রতি অবহেলা। জমিরুদ্দির গ্যাংগ্রিনগ্রস্ত পা নিয়ে চিকিৎসার প্রহসনকে অনাবৃত করেন আজিজুল। গোটা হাসপাতাল-টাকেই লেখক তুলে আনেন। একদিন মানুষ বলেছিল—স্বর্গ যদি কোথায়ও থাকে তবে তা এইখানে, এইখানে। আর আজিজুল বলতে চেয়েছেন নরক যদি কোথাও থাকে তবে তা এইখানে, এই-খানে। গল্পকার দেখতে পান সাংবাদি-কতার নামে দালালি আর সরকারি উন্নয়নের পিলসুজের নীচে অন্ধকার। যেখানে দাঁড়িপাল্লায় ভাত বিক্রি হয়। সাংবাদিকের বিবেক ধ্বস্ত হয় এই প্রহসনে। পাতালে হাসপাতালের গল্প-গুলিতে আজিজুল কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও অবক্ষয়ের দৃশ্যে ভারাতুর। তিনি নিজেও শাহেদের (খনন) মতো একজন সাংবাদিক। ফটোগ্রাফারের মনোযোগে তিনি বাংলাদেশের ছবি লেখেন। ছবির রঙ, রেখা বড়ো বেশি উত্তেজক, বড়ো বেশি স্পষ্ট। আজি-জুলের লেখার বৈশিষ্ট্য এখনও ঠিক পরিণতি পায় নি। গল্পরচনায় তিনি এখনও পরীক্ষা করে চলেছেন। শিল্পের দাবি এবং রূঢ় বাস্তবতার দাবি —এ দুয়ের ব্যবধান এখনও ঘুচে যায় নি আজিজুলের লেখায়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশে এক-জন প্রতিভাবান গল্পকারের অভ্যুদয় ঘটেছে। তাঁকে স্বাগত জানাই।

'যুবরাজ' উপন্যাসে হাসানত আব-দুল হাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের করুণ পরিণাম লক্ষ করেছেন। উপ-ন্যাসটির নায়ক রাজ টগর নামে এক বেশ্যার ঘরে আত্মগোপন করে আছে। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারই শত্রু-পার্টি। রাজ একদা ছিল দুরন্ত, দুর্ধর্ষ, মুক্তিযুদ্ধের নায়ক। পরে সে হয়ে পড়ে সুবিধাবাদী এবং দল-বাজিতে দক্ষ। স্বার্থ আর লোভ তার চরিত্র হনন করে। স্বার্থের জন্যে সে খুন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। একদিন সে ধরা পড়ল শত্রুর হাতে। বিচারে রাজের মৃত্যুদণ্ড হল। কিন্তু দলপতি রাজের মৃত্যুদণ্ড রদ করে নিজের দলেই নেতৃত্বে বরণ করে নিল। ভীরু, আত্ম-গোপনকারী রাজ আবার হয়ে উঠল ক্ষমতালোভী, চক্রী এবং খুনী। সে তার প্রেমিকা নাজলীকে খুন করে বসে দলেরই সাহায্যে।

হাই সাহেবের এই উপন্যাস আশা এবং আশাভঙ্গের ইতিহাস। উপন্যাস-টিকে অনেকটা ওয়াগন-ব্রেকার যুবক-দের কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই মস্তানরা পার্টির দ্বারাই লালিত-পালিত হয়। ক্ষমতাসীন দল এদেরই সাহায্যে ভয়ভীতির পরিবেশ গড়ে তোলে দেশব্যাপী। পাড়ায়-পাড়ায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে পার্টির মুখোশধারী এইসব মস্তান।

উপন্যাসটি সেদিক থেকে তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাকেই তুলে ধরেছে। রাজের টগরের ঘরে অজ্ঞাতবাস থেকে পরিণতি পর্যন্ত দৃশ্যগুলি দ্রুত পরি-বর্তিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। অবা-ঙালি আসলামকে রাজ যেভাবে খুন করল এবং খুন করে দলীয় রাজ-নীতির শকুনিপথে সে যেভাবে বিত্ত সঞ্চয় করল, তার বিবরণ ক্ষুদ্রায়তন একটি দৃশ্যে চিত্রিত। অথবা প্রচণ্ড কিল-চড় খেয়ে রাজের যেখানে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া উচিত সেখানে মুহূর্তে রাজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়া পাঠককে কিরকম বিভ্রান্ত করে। কিংবা রাজের পারিবারিক কাহিনীতে যেখানে মা এবং বাবার কথা বলা হয়েছে, সে দৃশ্যও উপন্যাসের বিস্তৃতি পায় নি। বহুদিন পরে রাজের নিজের বাড়িতে আসা এবং তার বুভুক্ষিত হৃদয়ের স্নেহ-উছলতা অথবা শফিক সাহেবের মিছিল করে যাওয়া এবং রাজের হাতে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার স্বপ্নকাহিনী হাই সাহেব বলে যান অনায়াসে। টগরের বাড়িতে পুলি-শের হানা দেওয়া এবং টাকা দিয়ে টগরের পুলিশকে বশ করা নিতান্তই পরিচিত সাদামাঠা কাহিনী মনে হয়। কেরামত আলীর নেতৃত্বে এখন যে যুবসংস্থা গঠিত হয়েছে তাদের গুন্ডামি, শাসানি, ঔদ্ধত্য বর্ণনায় হাই উৎসাহী।

আসলে হাই সাহেব খুব বিচলিত। নীতিবোধের ক্ষয়ে তিনি অস্থির। মুক্তিকামী মানুষের ভোল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বোলবদলের আত্মহনন হাইকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। এরই মধ্যে তিনি খুঁজে পান শফিক সাহেবের প্রতিবাদ, নীতিবোধে বিশ্বাস। আর টগরের নারীত্বের মহত্ত তুলে ধরেন হাই ছোটো একটি সংলাপে।

আবদুল হাইয়ের উপন্যাসে সাংবা-দিকতার কড়া এবং চড়া রঙ যেন একটু বেশি। তাৎক্ষণিক বস্তুকে তিনি শাশ্বত কালে পৌঁছে দিতে পারেন নি। সমস্ত উপন্যাসটিতে লেখকের নিয়ন্ত্রণ বড় বেশি বলে মনে হয়। ঘটনা, চরিত্র নিজস্ব নিয়মে সৃষ্ট মনে হয় না। লেখকের ইচ্ছাপূরণের উপায় মাত্র এসব। তবে ডকুমেনটারি চিত্র হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য আছে।

বিজিতকুমার দত্ত

আবার পনজাব

অকাল তখতের প্রধান পুরোহিত জাঠেদার কৃপাল সিং শিখদের কাছে আকুল আবেদন করেছেন, "স্বর্ণমন্দিরে গুন্ডামি আর হাঙ্গামার যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে কোনো-কোনো গোষ্ঠী, আপনারা তার বিরুদ্ধে সত্যিকারের ব্যবস্থা নিন।"

ইংরেজিতে এই মর্মে একটা প্রবাদ আছে : শয়তানের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করবার সময়ে লম্বা হাতলের চামচ ব্যবহার করুন—অর্থাৎ একটু তফাতে বসে খান। আর তা ছাড়া, ফাউসটের সেই কাহিনী কে না জানে। শয়তানের কাছে তিনি নিজের আত্মা বিক্রি করেছিলেন ; সেদিনের কথা ভাবেন নি যেদিন শয়তান সামনে হাজির হয়ে বলবে, এবার দখল চাই।

জাঠেদার কৃপাল সিং-এর কি আজ মনে পড়ে, 'ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার খবরে আমি আনন্দিতও হই নি, দুঃখিতও হই নি'—এ কথা কে বলে-ছিলেন ? আজ তাঁরই শ্রীমুখে যে কাতর প্রার্থনা শুনছি, "গুন্ডা আর হাঙ্গামা-কারীদের হাত থেকে স্বর্ণমন্দির উদ্ধার করে দাও, আমার অকাল তখন আমাকে ফিরিয়ে দাও", এ যদি বড়ো দুঃখের না হত, তা হলে কৌতুক বোধ করতাম। ক্ষণিক লাভের আশায়, ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির মোহে, হিংস্র ধর্মান্ধতার দিকে বন্ধুত্বের হাত বারে-বারে বাড়িয়ে দিয়েছেন যেসব অকালি নেতারা, গুরু-দ্বার প্রবন্ধক সমিতির কর্ণধারেরা, ধর্মস্থানের শীর্ষস্থানীয় পুরোহিতেরা, তাঁরা যদি আজ বিপন্নবিস্ময়সহকারে আবিষ্কার করে থাকেন—যৎসামান্য প্রাপ্তির জন্যেও প্রভূত মূল্য দিতে হয়, আসলের চেয়ে সুদ বেড়ে যায় অনেক, এবং তা চুকিয়ে দিতে না পারলে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেয় পাওনাদার, তা হলে দোষ দেবেন তাঁরা কাকে ?

অনেকে নাকি তাজ্জব হয়ে গেছেন কত সহজে শিরোমণিগুরুদ্বারপ্রবন্ধক সমিতির কর্তাব্যক্তিরা হার মানলেন, তাই দেখে। অল ইনডিয়া শিখ স্টুডেনটস ফেডারেশন এবং দমদমী তকশাল এত শক্তিশালী ? তা হলে আজ তারা যেমন স্বর্ণমন্দির দখল করল, কাল তো শিখ গুরুদ্বারপ্রবন্ধক-সমিতিও কবজা করে নেবে ? তখন আর অকালি দলের জোরটা কোথায় থাকবে ? অনেকে ইতিমধ্যেই এই লাইনে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। আর

দেশে বিদেশে

সে চিন্তা শুধু অকালি নেতৃবৃন্দের জন্যেই নয়, পনজাবের জন্যে, এবং সেই সঙ্গে গোটা দেশের জন্যেও বটে। নির্বাচনে অকালি দলের জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যেমন গোটা দেশের লোক কতকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে-ছিল, উগ্রপন্থার সামনে অকালি দলের পিছু হঠবার লক্ষণ দেখে তেমনি পনজাবের বাইরেও একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়তে বাধ্য। যাঁদের দায়িত্ব ছিল এইরকম একটা অবস্থার যাতে উদ্ভব না হয়, উগ্রপন্থা যাতে মধ্যপন্থাকে ঠেলে ফেলে দেবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে, তা দেখার, তাঁরা, প্রায় দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, এবার কোন্ পন্থা অবলম্বন করার কথা ভাবছেন, অন্তত আত্মরক্ষার তাগিদেও সাহসে বুক বেঁধে কিছু একটা করার কথা সত্যি-সত্যিই চিন্তা করছেন কিনা, এখন সেইটেই দেখবার জন্যে তাকিয়ে আছে সারা দেশ। এ পর্যন্ত যতটুকু দেখা গেছে, অনেক বিচার-বিবেচনার পর, সম্ভবত অনেক দ্বিধা দুর্বলতা জয় করে, শিরোমণিগুরুদ্বারপ্রবন্ধক সমিতি আনন্দপুর সাহেবের নিরাপদ দূরত্বে বসে অকাল তখতের জাঠেদার কৃপাল সিংকে বলেছেন, সরবত খালসা ডাকুন। সঙ্গে-সঙ্গে দমদমী খালসা আহূত সরবত খালসার যিনি অকাল তখতের "অস্থায়ী জাঠেদার" নিযুক্ত হয়েছেন, সেই ভাই গুরুদেব সিং ঘোষণা করেছেন, কৃপাল সিং আর জাঠেদার নন, তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অতএব সরবত খালসা ডাকবার তাঁর কোনো অধিকার নেই। জাঠেদার কৃপাল সিংয়ের সরবত খালসা ডাকবার অধিকার আছে কিনা, তাঁকে বরখাস্ত করবার অধিকার ২৬শে জানুয়ারির "সরবত খালসা"র ছিল কিনা, তাঁর অধিকার নেই সে কথা বলবার অধি-কার ভাই গুরুদেব সিং-এর আছে কিনা, এসব জটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার মতো কোনো বিশেষজ্ঞ হাতের কাছে পাচ্ছি না, এ নিয়ে কোর্ট-কাছারি করতেও কেউ এগোবেন বলে মনে হয় না। তবে একটা কথা আইনজ্ঞ ব্যক্তি-দের বলতে শোনা যায়, "অকিউপেশন ইজ নাইন পার্টস অব ল", দখল করে যে বসে আছে, আইনের দশ ভাগের ন ভাগই তার পক্ষে।

অকাল তখত এবং স্বর্ণমন্দির এখন যাঁদের দখলে তাঁরা যদি সাংগঠনিক আইনের প্রবন্ধক সমিতি-কৃত ব্যাখ্যা না মানেন, দখল না ছাড়েন, জাঠেদার কৃপাল সিংকে তাঁর অকাল তখতের ধারে-কাছে ঘেঁষতেই না দেন, তখন উপায় কী হবে ? এদিকে দমদমী তকশাল-এর করসেবা চলছে। এবং এ করসেবা তাঁরা শিরোমণিপ্রবন্ধকসমিতির সম্মতি এবং অকালি দলের অনুমতি নিয়েই আরম্ভ করেছেন। কাজেই, যতদিন করসেবা

সম্পূর্ণ না হয়, স্বর্ণমন্দিরে দখলদার উচ্ছেদের কোনো চেষ্টা করতে গেলে তার কী ফল হতে পারে, শিখ সমাজে কী তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কে বলবে? আবার সেই অপারেশন ব্লু স্টার? ঈশ্বর না করুন।

ইতিহাস কখনো অক্ষরে-অক্ষরে নিজের পুনরাবৃত্তি করে না। দ্বিতীয় অপারেশন ব্লুস্টার যদি হয়, তার জের কতদূর গড়াবে? তার ধাক্কা সামলাতে গান্ধী-লঙ্গোয়াল চুক্তির মতো আবার কি চুক্তি হবে? হায়, একবার যদি আশা ভাঙে, আর সে কোনো দিন বেমালুম জোড়া লাগে না।

তাই যদি হয়, তার জন্যে পুরো-পুরি দায়ী হবে অকালি দল এবং শিরোমণিগুরুদ্বারপ্রবন্ধকসমিতি। এবং দায়ী হবেন জাঠেদার কৃপাল সিং-এর মতো ধর্মীয় নেতারা, যাঁরা অনভ্যাসে ভুলেই গেছেন শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানো কাকে বলে, যাঁরা দু-কূলই বাঁচাতে গিয়ে ("ইন্দিরার হত্যায় আনন্দিতও নই, দুঃখিতও নই") শেষ পর্যন্ত দেখছেন, দু-কূলই বুঝি ভেসে যায়।

এঁরা ইনচি-ইনচি করে উগ্রপন্থাকে জায়গা ছেড়ে দিতে-দিতে এখন দেখছেন, নিজেদেরই দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। এঁরা কোনোরকম করে টিঁকে থাকাটা জীবনের মহত্তম লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলেন, এখন দেখছেন টিঁকে থাকাই দায় হয়েছে। সৈয়দ মুজতবা আলি এক জায়গায় বলেছিলেন, ঠিকমত বাঁচতে হলে মরতে জানতে হয়। এঁরা না জানেন মরতে, না বাঁচতে।। অন্যের মৃত্যু এঁদের কাছে খুব সহজ, আর নিজের বেলায়? বিভীষিকা।

স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ কাউকে করতে বলি না। মৃত্যুভয় জীবমাত্রেরই পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একটি সহজাত বৃত্তি। মৃত্যুভয় না থাকলে অনেক দিন আগে পৃথিবীর বুক থেকে প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু ঠিকমত বাঁচতে গেলে বাঁচার উপযোগী পরিবেশটাকেও বাঁচিয়ে রাখা দরকার। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার অন্ধকার এ যুগের বুকের ওপর চেপে বসলে, তাতে খুশি হবার কারণ থাকবে না কারোই, এমনকি আজ যাঁরা সেই অন্ধকারকে আবাহন করছেন, তাঁদেরও। কাজেই, এখনই সময় যাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ কতিপয় ধর্মোন্মত্ত, হিংসাশ্রয়ী যুবক এবং অভিসন্ধিপরায়ণ বৃদ্ধের হাতে তুলে দিতে চান না, তাঁদের স্পষ্ট করে নিজেদের মনোভাব জানাবার। 'যদি', 'কিন্তু' ইত্যাদির আড়ালে নিজেকে গোপন করবার চেষ্টা, দুদিকই বজায় রাখবার চেষ্টা করলে বজায় থাকবে না কিছুই, একে-একে সবই ছাড়তে হবে। যেসব অধিকার, যতটা স্বাধীনতা আমরা আলো-বাতাসের মতোই সহজ বলে মনে করি, ক্ষমতা হাতে পেলে উগ্র ধর্মধ্বজীরা তার সবই কেড়ে নেবে, একথা যেন মনে থাকে। মানুষের অধিকার, মানুষের স্বাধীনতা, এমন কি মানুষের ধর্ম-চেতনা অথবা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, যাই বলুন, তার কতকটা মূল্য আমাদের ধর্মনায়কদের কাছে, তার পরিচয় সম্প্রতি দিয়েছেন বিশ্ব হিন্দুপরিষদের সাধারণ সচিব। 'সানডে' সাপ্তাহিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (২-৬, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬), পোপের ভারতে আগমন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আমি একথা পরিষ্কার করে জানাতে চাই, যখন কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে এমন কোনো ধর্ম গ্রহণ করে যা এদেশের নয়, সে হয় জাতিবিরোধী, অ্যানটিন্যাশনাল।" বিশ্ব-হিন্দুর বাপের ভাগ্য যে তেমন কোনো জবরদস্ত ধর্মীয় সংগঠন তাদের নেই, যার উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে এঁরা দণ্ড-মুণ্ডের ভার নিজের হাতে নিতে পারেন।

পনজাবের ঘটনা আবার নতুন করে দেখিয়ে দিল—মূঢ়তা, অন্ধত্বর সঙ্গে আপোসমূলক সহাবস্থান চলে না, কেন না মূঢ়তা এবং অন্ধত্বেরও নিজস্ব একটা শক্তি আছে, এবং সে কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তাকে পিছু হঠাবার কাজে অবহেলা করলে সে ক্রমশ এগিয়ে আসবে।

পনজাবে তাই হয়েছে। রাজীব গান্ধী কেন তাড়াহুড়ো করে লঙ্গোয়ালের সঙ্গে চুক্তি করলেন; কেন তার আগে পনজাবের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে, হরিয়ানার ভজনলালের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন না; ম্যাথিউ কমিশনকে কেন অন্য টার্মস অব রেফারেনস দিলেন না, ২৬শে জানুয়ারিই যাতে পনজাব চণ্ডীগড় পেয়ে যায় তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত কেন করলেন না; এসব প্রশ্ন উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে পনজাবের যেটা আসল সংকট তার মূল অন্যত্র। নয়া দিল্লি থেকে তার কোনো সমাধান আসবে না। পনজাবেরই রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় এবং ধর্মীয়-রাজনৈতিক নেতাদের খুঁজে বের করতে হবে সে সমাধান। এবং তাঁরা যদি তাতে অপারগ হন, যদি তাঁদের শক্তিতে এবং সাহসে না কুলায়, যেসব সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন ধর্মের নামে রক্তপিপাসু হিংস্রতা সহ্য করে যাচ্ছেন, যাঁরা পরিশীলিত বুদ্ধি এবং পরিচ্ছন্ন বিবেকের অধিকারী, তাঁদেরই এগিয়ে এসে বলতে হবে, "অনেক হয়েছে, আর নয়।"

গরবাচভের নতুন প্রস্তাব

গত ১৬ই জানুয়ারি, জেনেভাতে রুশ-মারকিন পারমাণবিক অস্ত্র এবং অন্তরীক্ষস্থিত অস্ত্র বিষয়ক আলোচনার চতুর্থ পর্যায়ের প্রাক্কালে, সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচভ পারমাণবিক অস্ত্রের বিলোপসাধনের যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ঘোষণা করেন, তার ফলে বিশ্বের দুই প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে কিছু বোঝাপড়ার সম্ভাবনা খানিকটা উজ্জ্বল হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

গরবাচভের প্রস্তাব গোচরে আসার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রেসিডেনট রেগান একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন: "আমাদের মিত্রদেশগুলির সঙ্গে একযোগে আমরা জেনারেল সেক্রেটারি গরবাচভের প্রস্তাব যত্নসহকারে অধ্যয়ন করব।" কেন না, যদিও রেগানের মতে, "প্রস্তাবের অনেক কিছু সোভিয়েত রাশিয়ার আগেকার বক্তব্যের মতোই, এবং আমেরিকার পক্ষে দুশ্চিন্তাজনক, এতে অন্য কথাও আছে, প্রথম নজরে মনে হয় যেগুলো সদর্থক।" এর আগে সোভিয়েত তরফের কোনো নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব সম্পর্কে মারকিন প্রতিক্রিয়ায় এমন দ্রুততার সঙ্গে এত কম প্রতিকূলতা প্রকাশ পায় নি। রেগান তাঁর ওই বিবৃতিতে বলেছেন, "১৯৮৩ সালে জাপানের সংসদে আমি পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপের প্রস্তাব করেছিলাম। তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক প্রস্তাব উত্থাপন করে এসেছে, সমরাস্ত্র আমূল হ্রাস করে ওই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে। এমন কি ১৯৮১ সালেই আমি একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সমস্ত দূরপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র লোপ করা হোক। নভেম্বরে জেনেভাতে অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আলোচনায় আমরা আরও একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যার লক্ষ্য ছিল, শূন্য সংখ্যার পারমাণবিক অস্ত্র। এখন সোভিয়েত রাশিয়া সাড়া দিয়ে যে প্রস্তাব করেছে, আমাদের আগেকার প্রস্তাবিত কোনো-কোনো বিষয়ের ভিত্তিতেই তা রচিত। আমি সোভিয়েত রাশিয়ার এই সাড়াকে স্বাগত জানাই, এবং আশা করি এর দ্বারা অগ্রগতিতে খানিকটা সহায়তা হবে।"

গরবাচভের প্রস্তাবে মূল বিষয় ছিল এই দুটি: আগামী ১৫ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে পারমাণবিক অস্ত্রহ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত বিলোপ; গত ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষার ওপর যে নিষেধ অন্য-নিরপেক্ষভাবে রাশিয়া জারি রেখেছিল, আরও তিন মাসের জন্যে তার সম্প্রসারণ।

সম্ভবত এই দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কেই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির কথা রেগান বলছিলেন। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-বন্ধের প্রস্তাব মসকো আগেই দিয়েছে, এবং সে প্রস্তাব ওয়াশিংটন আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। সেসব পরীক্ষা বন্ধ রেখে, বিশেষ করে যখন সোভিয়েত সামরিক শক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের একটা লক্ষ্য রেগান প্রথম থেকেই সামনে রেখেছেন, পারমাণবিক ক্ষেত্রে নিজেদের অগ্রগতি, এখন, এই অবস্থায় একদিনের জন্যেও বন্ধ হতে দিতে আমেরিকা রাজি হবে, অমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

তবু, রেগান প্রথম বিবৃতির পরের দিনই আরেক বিবৃতিতে আবার গরবাচভের প্রস্তাবের প্রশংসা করেছেন: "আমরা এই প্রস্তাবের জন্যে অতিশয় কৃতজ্ঞ। বলতে গেলে এই প্রথম কেউ সত্যি-সত্যিই পারমাণবিক অস্ত্র সরিয়ে ফেলার কথা বললেন।"

গরবাচভের প্রস্তাব: ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র বাতিল হয়ে যাবে, এবং এখনই ইউরোপে সোভিয়েত এবং মারকিন মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরানো শুরু হবে, এবং ব্রিটিশ আর ফরাসি পারমাণবিক অস্ত্রও আর বাড়তে দেওয়া হবে না, যাতে যথাসময়ে সেগুলোও বাতিল করা যায়।

এখন, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবী পারমাণবিক অস্ত্রের ভার নামিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে, এই চিন্তা যেমন একদিকে অতিশয় আরামদায়ক, আরেক দিকে তেমনি কিছু-কিছু দুশ্চিন্তারও কারণ এর ফলে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে। এতাবৎকাল মারকিন পারমাণবিক প্রতিরক্ষার ছত্রছায়ায় পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার মিত্রদেশগুলি কতকটা নিরাপদ বোধ করে আসছে। সেই ছাতা যদি আমেরিকা গুটিয়ে নেয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য তাদের নির্ভর করতে হবে সাবেকি অর্থাৎ অ-পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর, এবং সৈন্যসামন্তের ওপর। তাদের পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ এই যে, অ-পারমাণবিক অস্ত্রে এবং সাধারণ সমরসজ্জায়, এবং সামরিক বাহিনীর বহরে, সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় এত বেশি শক্তিশালী যে, শুধুমাত্র নিজেদের সম্মিলিত সমরশক্তির ওপর নির্ভর করা, আর সোভিয়েত রাশিয়ার দয়ার ওপর নির্ভর করা—তাদের পক্ষে একই দাঁড়াবে। তা যদি না করতে হয়, পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহকে সমরসজ্জার ব্যয় এত বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে যে তার ভার সহ্য করা তাদের অর্থনীতির পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার পশ্চিম-ইউরোপস্থিত মিত্রদের এই আশঙ্কা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কাজেই, প্রথম চোটে রেগান যাই বলে থাকুন, ইউরোপ থেকে মারকিন ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণের প্রস্তাব নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে বাধ্য।

অথচ, নানা দিক থেকে গরবাচভের প্রস্তাবে এমন অনেক কথাই ছিল যা নতুন এবং যা কাজের। যথা, এতদিন পর্যন্ত মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের যা নিয়ে প্রধান আপত্তি ছিল, অস্ত্র-চুক্তি কার্যকর হচ্ছে কিনা তার যাচাইয়ের সন্তোষজনক ব্যবস্থার অভাব, সে বিষয়ে মসকো জানিয়েছে একেবারে অস্ত্রের ঘাঁটিতে গিয়ে পর্যবেক্ষণে তাঁরা সম্মত। এমন কি, রেগানের "স্ট্র্যাটেজিক ডিফেনস ইনিশিয়েটিভ" অর্থাৎ স্টার ওয়ারস পরিকল্পনা সম্পর্কেও, যদি শুধু তা নিয়ে শুধু মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাই করা হয়, মসকো তার এতদিনকার অনড় মনোভাব ত্যাগ করেছে।

অবশ্য একথাও সঙ্গে-সঙ্গে সে জানিয়েছে, স্টার ওয়ারস প্রকল্পের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা এবং সে অস্ত্রশস্ত্রের স্থাপনের সংকল্প রেগানকে ত্যাগ করতে হবে। গরবাচভের সমস্ত প্রস্তাব তার ওপর নির্ভর করছে।

এই-সমস্ত বাধাবিপত্তি এড়িয়ে গরবাচভের সর্বাধুনিক প্রস্তাব সত্যি-সত্যিই বিশ্বকে পারমাণবিক বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করবার আশ্বাস এনে দিতে পারে কিনা, সেইটাই এখন দেখবার। ৫.২.১৯৮৬

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নানা প্রসঙ্গ

১

ভারততত্ত্ববিদ আরথার লিউয়েলিন ব্যাসম

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারির সকাল। বিশ্ববিশ্রুত ভারততত্ত্ববিদ আরথার লিউয়েলিন ব্যাসম কলকাতার এক নারসিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যে ক্যানসার রোগ তাঁকে কিছুকাল আগে আক্রমণ করেছিল, তার কাছে তাঁর দেহকে নতি স্বীকার করতে হল। কিন্তু তাঁর রচনাবলীর, তাঁর বিদ্যানুরাগের স্মৃতির মৃত্যু হবে না। ওইগুলি শিক্ষক এবং ছাত্রদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ব্যাসমের জন্ম ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যানডের অন্তর্গত এসেকসের লাইটনে। মা মারিয়া জেন, বাবা সাংবাদিক আরথার আব্রাহাম এডোয়ার্ড ব্যাসম।

ব্যাসমের ছেলেবেলা কাটে নরফোক ও সাফোক অঞ্চলে। এক আঞ্চলিক গ্রামার স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে কিছুকাল পড়াশুনা বন্ধ রাখতে হয়। পরে লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েনটাল অ্যানড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ প্রাচীন ভারতের আজীবিক ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মতবাদ সম্পর্কে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৫০-এর শেষে কিংবা ৫১-এর গোড়ার দিকে। গবেষণার ফল প্রকাশিত ১৯৫১তে 'হিসট্রি অ্যানড ডকট্রিনস অব দি আজীবিকস' নামে। অনেক পরে হয় ১৯৫১তে 'হিসট্রি অ্যানড ডকট্রিনস লয়ের ডি. লিট. ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত স্কুল অব ওরিয়েনটাল অ্যানড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ অবধি ক্যানবেরাস্থিত অসট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জেনারেল স্টাডিজ্-এ অধ্যাপনা করেন ড· ব্যাসম। এ ছাড়া তিনি ভারত, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বল্পকালীন মেয়াদে শিক্ষকতা করেন।

অল্প বয়সেই অসাধারণ শিক্ষক এবং গবেষণার তত্ত্বাবধায়করূপে তাঁর খ্যাতি ভারতবিদ্যাচর্চার সব মহলেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা (যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক) আসত তাঁর অধীনে গবেষণা করতে। এই রকম প্রায় একশ জন ছাত্র তাঁর অধীনে গবেষণা করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রায় কুড়িজন আজ ভারততত্ত্বের একেবারে প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এই সাফল্য আর কোনো ভারততত্ত্ববিদ দাবি করতে পারেন না।

ছাত্রদের অধ্যাপক ব্যাসম অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিদেশে অধ্যয়নের সময় তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সে দিকে তাঁর নজর থাকত সর্বদা। ছাত্রদের তিনি মনে করতেন তাঁর 'অ্যাকাডেমিক চিলড্রেন'।

ছাত্রদের জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করলেও অধ্যাপক ব্যাসম নিজের পড়াশুনায় কখনও অবহেলা করেন নি। নানা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী এর প্রমাণ। এগুলির কিছু সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে 'স্টাডিজ ইন ইনডিয়ান হিসট্রি অ্যানড কালচার' (১৯৬৪) এবং 'অ্যাসপেকটস অব ইনডিয়ান হিসট্রি অ্যানড কালচার' (১৯৬৬)। তবে শুধু এগুলি পড়ে ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি নির্ণয় করা যায় না। ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গভীর উপলব্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'ইনডিয়ান সাবকনটিনেনট ইন হিসটরিক্যাল পারসপেকটিভ' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে।

ছাত্রদের থিসিস সংশোধন করতে-করতে ড· ব্যাসম সম্পাদনার কাজেও সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন। অন্তত তিনটি গ্রন্থের ('পেপারস অন দ্য ডেট অব কণিষ্ক', 'দ্য সিভিলাইজেশনস অব মনসুন ইনডিয়া' এবং 'দ্য কালচারাল হিসট্রি অব ইনডিয়া') সার্থক সম্পাদনা তিনি একাই করেছিলেন। যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বভার তিনি সুচারুরূপে পালন করেছিলেন অপর একটি সংকলনগ্রন্থ প্রণয়ন করার সময়। এটির নাম 'সোরসেস অব ইনডিয়ান ট্র্যাডিশন'।

অতি দুরূহ বিষয়কে সহজ ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে ব্যাসমের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর প্রমাণ 'ওয়ানডার দ্যাট ওয়জ ইনডিয়া' (১৯৫৪) শীর্ষক গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এমন সহজবোধ্য ব্যাখ্যা আমাদের আর জানা নেই। বইটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

জ্ঞানী, সুশিক্ষক, ছাত্রদরদী ব্যাসম বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। যে-সব সম্মানজনক উপাধি তিনি পেয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে ডি. লিট. (কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়), "বিদ্যাবারিধি" (নালন্দা মহাবিহার) ও "দেশিকোত্তম" (বিশ্বভারতী) উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে দিয়েছিলেন বি.সি.ল স্বর্ণপদক। এ ছাড়া তিনি ছিলেন

সোসাইটির ফেলো (প্রথমে সাধারণ, পরে সাম্মানিক)।

১৯৭১-এর গোড়ায় ক্যানবেরাতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক ব্যাসম। ইনটারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব ট্র্যাডিশনাল এশিয়ান মেডিসিন-এর প্রথম সম্মেলনের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

ঐতিহাসিক ব্যাসমের মতে, ইতিহাস শুধু প্রত্নবস্তু আর পুরাতন পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে আছে সংস্কৃতির বিভিন্ন জীবন্ত বা ব্যবহৃত নিদর্শনের মধ্যেও। ভারত-সংস্কৃতির এইসব নিদর্শনগুলির প্রতি তাই তাঁর ছিল অসাধারণ আগ্রহ। সমসাময়িক কালে তিনি সন্তোষী-মা সম্পর্কিত ধ্যানধারণার ও মূর্তির উদ্ভব আর ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করেছিলেন প্রাচীন ভারতের মূর্তিতত্ত্বের বিকাশের ধারাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল এই পণ্ডিত আসলে ভারতকেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ভারতীয় (নমিতা ক্যাথরিন)। তাঁদের কন্যার নাম মারিয়া সাবিত্রী।

ইংল্যানডে জন্মগ্রহণ করলেও এবং পরে অসট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও ব্যাসম কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন এক বিশ্বনাগরিক। ভারত ছিল তাঁর সবথেকে প্রিয় দেশ। তাই বোধ হয় ঈশ্বর তাঁর কবরের জমির ব্যবস্থা করে দিলেন এদেশের মাটিতেই। মৃত্যুর দুই দিন পরে ২৯শে জানুয়ারি ব্যাসমের মরদেহ সমাহিত হল মেঘালয়ের রাজধানী শিলং-এ, তাঁর স্ত্রীর নিজের শহরে।

অধ্যাপক ব্যাসম ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন প্রথম শ্রেণীর ভারততত্ত্ববিদ, যদিও তাঁর থেকেও বড়ো পণ্ডিতদের নাম আমরা হয়তো করতে পারি। কিন্তু আমরা কি আর একজনও এমন ছাত্রদরদী, পিতৃতুল্য, ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সফলকাম তত্ত্বাবধায়কের কথা জানি? বোধ হয় না। এইখানেই ব্যাসমের বৈশিষ্ট্য আর মহত্ত্ব। তাই ভারততত্ত্বের চর্চা যতদিন হবে ততদিন ব্যাসম বেঁচে থাকবেন।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২

কবিতা-উৎসব : কিছু প্রাপ্তি, কিছু অতৃপ্তি

কবিতা কয়েকটি সংখ্যালঘু শুদ্ধশিল্পের একটি। সুতরাং তার পরিচয় এবং বিস্তার যে সর্বব্যাপী হবে না, এবং মাসপীপল-এর সঙ্গে কবিতার ঘনিষ্ঠতাও খুব সহজলভ্য হবে না, এ তো স্বাভাবিক কথা। কবিতাকে হয়তো দিনযাপনের সামগ্রী করার খানিকটা অভিপ্রায় নিয়েই 'আবৃত্তিলোক' কবিতা-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। পাঁচদিন ধরে, রাজভবনে, ভারতীয় ভাষা পরিষদে, শিশিরমঞ্চে আলোচনা, কবিতাপাঠ ছবি আর কবিতার একটি মিশ্র প্রদর্শনীরও উদ্যোক্তা ছিলেন এই 'আবৃত্তিলোক'।

১১ই জানুয়ারি ছিল উৎসবের উদ্বোধন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অশীন দাশগুপ্ত যে স্বল্পপরিসর বক্তব্যটি উপস্থাপন করলেন, তার গোড়ার অংশে 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব'-র উদ্ধৃতিময় কৌতুকপ্রাধান্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিক বাঙলা কবিতার স্বারূপ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করলেন দাশগুপ্ত মহাশয়—নিজস্ব বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত ধারণা এবং রুচিবোধের নিরিখে। তিনি বললেন, অর্ধ শতাব্দী বা তিরিশ বছর আগে বাঙলা কবিতায় যে কদর্যতা কুশ্রীতা ছিল, এখন সেই বিকৃতি থেকে বাঙলা কবিতা অনেকটা মুক্ত, অনেকটা সুস্থ।

দাশগুপ্ত মহাশয় অতিসাম্প্রতকালের কবিতা পাঠে অভ্যস্ত কি না আমরা জানি না, তবে যুগটা যে পূর্বের তুলনায় অধিকতর কুৎসিততর হয়ে উঠেছে, তা নিশ্চয়ই তাঁর নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না—তবে এখনকার কবিতা পূর্বের তুলনায় সুশ্রী হবে কেমন করে? এই স্ববিরোধ ঘুচল না।

ভারতীয় ভাষা পরিষদের অধিবেশনে 'আমার জীবনে কবিতার ভূমিকা' বিষয়ে মতপ্রকাশের জন্য আহূত ছিলেন অনেকে। উপস্থিত ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, নবকান্ত বড়ুয়া, (আসাম), সৌভাগ্য মিশ্র (উড়িষ্যা), গদ্যলেখক শৈবাল মিত্র, চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন, নাট্যাভিনেতা আর প্রযোজক কুমার রায়। শামসুর রাহমানের পরিচ্ছন্ন প্রতিবেদন, নবকান্ত বড়ুয়ার আন্তরিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা, শুভাপ্রসন্নের তুলি আর কলমের ওতপ্রোততা প্রমাণের সযত্ন প্রয়াস, রবীন্দ্রবলয়ে কুমার রায়ের সশ্রদ্ধ প্রদক্ষিণ, শৈবাল মিত্রের সৎ এবং নির্ভীক অনুভবের অকপট উচ্চারণ সভাটিকে সুন্দর করেছিল।

প্রতিবেশী কবিসমাজের মধ্যে আহূত ছিল আসাম, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা। তিনটি ভিন্ন দিনে নিজেদের কবিতার পরিপ্রেক্ষণা, আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, লক্ষণ পারস্পরিক আলোচনা, ভাববিনিময় এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাইলেন আমন্ত্রিত প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা। সাহিত্যপুরস্কারে সম্মানিত আসামের কবি নবকান্ত বড়ুয়া, উড়িষ্যার সীতাকান্ত মহাপাত্র এবং বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবি শামসুর রাহমানের গভীর, শৃঙ্খলিত অথচ সংযত অনতিদীর্ঘ বক্তব্য অসমীয়া কবিতা, বাংলাদেশের কবিতা এবং ওড়িষী কবিতার সামগ্রিক চেহারাটিকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল।

রাষ্ট্রিক উত্থানপতন, রাজনৈতিক টানাপোড়েন সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকে সব সময়েই নতুন গড়ন, নতুন আঙ্গিক দেয়। সাহিত্যকে নতুন নির্মাণে গড়ে তুলতে সমাজেতিহাসের যে পালাবদলটা একান্তই জরুরি, তার ওপর কবিদের কোনো হাত থাকে না। আধুনিক অসমীয়া আর ওড়িষী কবিতায় রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাতের কোনো রক্তাক্ত ভূমিকা নেই এখনও পর্যন্ত। যদিও খুব সাম্প্রতকালের আসামের ছিন্নমূল জীবন কবিতায় প্রগাঢ় প্রচ্ছায়া ফেলবে বলেই কবিদের বিশ্বাস। আসাম আর উড়িষ্যার কবিতার বাহ্যদশাকে নির্ণয় করেছে স্রেফ সামাজিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত। শব্দ বা ছন্দের ব্যাপারে অসমীয়া এবং ওড়িষী কবিরা ক্রমশ দুঃসাহসী হয়ে উঠছেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে বনিবনার তাগিদে—নিজস্ব কোনো ঐকান্তিক মূলধনের আর্ত পিপাসায় আর্দ্র হয়ে নয়। আমন্ত্রিত কবিদের অগভীর আলোচনায় মনের মধ্যে বাজছিল এ-সমস্ত কথা। যথেষ্ট প্রত্যাশা ছিল—বর্তমান অসমীয়া বা ওড়িষী কবিতার সামগ্রিক চেহারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হবে। নিরাশ হতে হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কবিতা কী? যুদ্ধোত্তর যুগ কিভাবে কবিতাকে বিবর্তিত করেছে? ইত্যাদি আলোচনা নিতান্তই গতানুগতিক মনে হল। কবিতার ওপর মার্কস এবং ফ্রয়েডীয় শাসনের অমোঘ বিধান, নির্দেশের মধ্য দিয়ে এদের স্বতন্ত্র চেহারা আদৌ বেরিয়ে আসে নি।

বিভাগের সীমারেখা বাংলাদেশের কবিতাকে দিয়েছে একটি নবতর আয়তন। যদিও দুই একই বাঙলার মধ্যে এই বিচ্ছেদজনিত প্রভিন্নতা যৎপরোনাস্তি বেদনাদায়ক। তথাপি একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে উপর্যুপরি রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিপর্যাস বাংলাদেশের কবিদের সুখ-স্বস্তির কবিতা লিখতে দেয় নি কখনোই। যার তুলনায় এপার বাঙলার কবিদের পক্ষে অনেক বেশি নরম কথা উচ্চারণ করা সম্ভবপর হয়েছে। দুই বাঙলায় খ্যাত বেলাল চৌধুরী জানালেন জিন্নার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দেশবিভাগসিদ্ধান্তজনিত যন্ত্রণা, আত্মীয়বিচ্ছেদ, ভাষান্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ঔপনিবেশিক অভিবাসন যে মারাত্মক প্রসাদকে বণ্টন করেছে কবিদের মনে, তার নাম হল 'সরোয়িং অ্যালফাবেটস'। আপাতিক সুখের মধ্যে থেকেও কবিদের মধ্যে মেলাংকলিয়া অথবা নসটালজিয়ার তীব্র অনুভূতি সাধারণ গড়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের কবিদের কবিতায়।

কাব্যসংগীতের আলোচনায় রাজ্যেশ্বর মিত্রের বক্তব্য তাত্ত্বিক ছিল, বিশ্লেষণমুখী ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সুরারোপিত কাব্যগুলিকে তিনি দৃষ্টান্তের জন্য বেছে নিলেন কেন? তাঁর মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে আমরা কেন আশা করব এত সরলীকৃত পন্থা? তিনি অবশ্য ব্যাকরণের ঋজু টানে সরল গণিতের মতো সমস্ত মেলালেন, কিন্তু কবিতাপ্রেমিকের সূক্ষ্মতম নন্দনবোধ তাতে তৃপ্তি পেল কিনা বলতে পারি না।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবিতা-উৎসবের দুটি বছর অতিক্রান্ত হল সাফল্যের সঙ্গে। কবিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসাজস ঘটানো এবং প্রতিবেশী কবিবর্গের চিন্তাসূত্রের যোগাযোগবিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কবিতা-উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ এবং আন্তর্ভারতীয় কবি আর কবিতার ভ্রাতৃত্বসন্ধানে আগ্রহী এই সংগঠন একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন এবং উৎসর্গ করেছেন শ্বেতনিগৃহীত কবি বেনজামিন মোলোয়াসির উদ্দেশে। তাদের এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

বর্ণালী দাস

মতামত

'মতামত' নাম দিয়ে একটি নতুন বিভাগ (ফীচার) খোলা হল। পাঠকেরা সংক্ষেপে (মোটামুটি ১০০০ শব্দের মধ্যে) যে-কোনো বিষয়ে লিখতে পারেন।

জানুয়ারি ১৯৮৬ সংখ্যার চতুরঙ্গে ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন' নিবন্ধে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে জরিপ বা সিংহাবলোকনটি অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। তবে 'পর্বতবাসী বৃদ্ধ' অনুচ্ছেদে মার্কো পোলোর বৃত্তান্তটিতে কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল আছে। 'মধ্যপ্রদেশের' কথাটি পোলোর নয়। তদুপরি ক্রুসেডের ইতিহাসবৃত্তান্তে এবং আসাসিন শব্দসংক্রান্ত অভিধানে উল্লিখিত 'ওলড ম্যান অব দ্য মাউনটেন' কথাটিকে ভবানীবাবু পোলোর বৃত্তান্তের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। পোলোর বৃত্তান্তে স্থানটির নাম 'মুলেহেট' এবং 'হুইচ মীনস হেরেটিকস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অব দ্য সারাসেনস, ইজ দ্য কানট্রি হোয়ার দ্য শেখ অব দ্য মাউনটেন ইউজড টু লিভ' ইত্যাদি। (দ্য ট্রাভেলস অব মারকো পোলো—অনুবাদ রোনালড লাথাম, পেঙ্গুইন, ১৯৭৯। পৃষ্ঠা ৭০—৭১ দ্রষ্টব্য) ইয়োরোপীয় লেখকেরা স্যারাসেন শব্দটি মুসলিমদের বোঝাতে প্রয়োগ করত, সে প্রয়োগও অজ্ঞতাবশত। এশিয়া মাইনরের প্রাচীন 'স্যারাসেন' নৃগোষ্ঠী পরে মুসলিম হয়েছিল, তাই এ বিভ্রান্তি। যাই হোক, সে প্রসঙ্গ অবান্তর এখানে। গ্রীক বৃত্তান্তকার এবং 'ইতিহাসের জনক' বলে অভিহিত হেরোদোতাসকে যেমন 'মিথ্যার জনক' বলেছিলেন পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকরা, তেমনি পোলোর বৃত্তান্তকেও মিথ্যার জাহাজ বলা হয়। প্রথম কথা, পোলো নিজে বইটি লেখেন নি। ১২৯৮-৯৯ খ্রী নাগাদ জেনোয়ায় জেলে কয়েদি থাকার সময়ে পিসার অধিবাসী আরেক কয়েদি রাস্তিচেল্লোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এই রাস্তিচেল্লো ছিলেন একজন রোমানস-লেখক। বস্তুত, ইনিই পোলের মুখে শুনে ভ্রমণবৃত্তান্তটি লেখেন। সত্য-মিথ্যায় জড়িয়েমড়িয়ে একটি ভ্রমণকাহিনী, একালের তথাকথিত বঙ্গীয় ভ্রমণকাহিনীগুলি নিঃসন্দেহে যার উত্তরসূরিবৃন্দ। আসলে বরাবরই এই এক বহমান ট্র্যাডিশন যেন, পর্যটকরা গুলতাপ্পি দেবেনই। ১৯৮০ সালে আমেরিকায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের সুপণ্ডিত মারকিন অধ্যাপক আমাকে তাঁর কোণারকে 'স্বচক্ষে' দেখা ভারতীয় সাধুর নিরলম্ব শূন্যে উত্থানের বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর উলটোও আছে। যাই হোক, এটাই ট্র্যাডিশন। তবে প্রাচীন পর্যটকদের বইপত্তর ঘাঁটলে দেখা যায়, গুলতাপ্পি এবং ভ্রান্তিতে তারা ওস্তাদ ব্যক্তি। অথচ তাদের ওপর নির্ভর করে কত পর্বতপ্রমাণ ইতিহাসও লেখা হয়ে গেছে।

এবার 'পর্বতবাসী বৃদ্ধ' এবং 'আসাসিন'-এর কথা বলি। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের কমপক্ষে বারচারেক বড়ো ধরনের ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল (কেউ-কেউ ছ-বারও বলেন)। এই ক্রুসেড নিয়ে ইউরোপে বহু উৎকৃষ্ট সাহিত্য বা গাথা রচিত হয়েছে। 'পর্বতবাসী বৃদ্ধের' নাম খ্রীষ্টান ইতিহাসে বা অন্যত্র পোলোর মতোই ম্যাহোমেট বলে উল্লিখিত। আরবি 'মোহাম্মদ'-এর ইউরোপীয় উচ্চারণবিকৃতি। তবে কাহিনীটি কিছুটা সত্য। অর্থাৎ ঐতিহাসিক-উপাদান-সমন্বিত।

ইসলাম-প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমার সঙ্গে তাঁর অন্যতম প্রধান অনুচর আলির বিয়ে হয়, এবং এই দম্পতির কনিষ্ঠ পুত্র হুসেন ইউফ্রেতিশতীরে করবালা-যুদ্ধে নিহত হন, যে ঘটনার স্মৃতিতে শোকপালনের অনুষ্ঠান 'মুহর্‌রম'। মিশরের সুলতানরা (খ্রী দশম শতক) নিজেদের ফাতেমা-আলির বংশধর বলে দাবি করতেন, এবং ইতিহাসে তাঁরা ফাতেমীয় বংশ বলে অভিহিত। এঁদের প্রতিষ্ঠাতা-শাসকের নাম ছিল নিজার ইসমাইল (ইউরোপীয় ভাষায় নিসার), যে কারণে এঁরা ইসমাইলি শাসক নামেও ইতিহাসে পরিচিত। এঁরা ছিলেন শিয়া অর্থাৎ আলিপন্থী। 'শিয়া' শব্দের মূল অর্থ দল। পরে 'কালো' অর্থেও শব্দটি প্রযুক্ত হয়। কারণ তাঁরা কারবালা-যুদ্ধ স্মরণে কালো পোশাক পরতেন শোকবস্ত্র হিসেবে। এটি খ্রীষ্টীয় সূত্রে লব্ধ।

এই নিজারি ইসমাইল থেকে শিয়াদের আরও গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে। মোটামুটিভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত শিয়াদের প্রায় সব গোষ্ঠী দ্বাদশ-ইমামতত্ত্বে বিশ্বাসী। তার মানে, আলি প্রথম ইমাম এবং দ্বাদশতম ইমাম হলেন মাহাদি, যিনি নাকি সিরিয়ার এক পাহাড়ি গুহায় অন্তর্হিত হন এবং তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটবে রোজকেয়ামত (বাইবেলি ডুমসডে)—বিশ্বধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বযুগে। কিন্তু নিজারি ইসমাইলদের তত্ত্বটি সপ্ত-ইমামের। 'পর্বতবাসী বৃদ্ধটি' ছিলেন সিরিয়ার এক নিজারি ইসমাইলি ধর্মগুরু, যাঁর নাম ছিল মোহাম্মদ। প্রথম ক্রুসেডের যুগে (প্রখ্যাত সুলতান সালাদিনের কালে, যিনি বহু ইউরোপীয় এপিক উপন্যাসের একটি প্রশংসিত চরিত্র), ওই নিজারি ধর্মগুরু মোহাম্মদ খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করেন। এজন্য তিনি 'সুইসাইড স্কোয়াড' গঠন করেন। এই স্কোয়াডটিকে আরবি ভাষায় বলা হত 'আসিসিন'। ধর্মপ্রাণ অর্থে শব্দটি আরবিতে আছে। এই স্কোয়াডের প্রতীকী উত্তরাধিকার সমকালের প্যালেস্টাইনি গেরিলাদের 'কার-বোম' বা গাড়িবোমা। নাৎসি হিটলারের আমলে বহু ক্ষেত্রে এবং অন্যপক্ষে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধেও রুশ 'সুইসাইড স্কোয়াড' কাজে লাগানো হয়েছিল। স্তালিনগ্রাদে নাৎসি বাহিনীর পরাজয়ের কারণ এটাই।

নিজারি ইসমাইলি নেতার ঘাঁটি ছিল উত্তরসিরিয়ার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়। তাঁর স্কোয়াডের কাণ্ডকারখানা দেখে খ্রীষ্টানরা ভীষণ অবাক হবেন, সেটা স্বাভাবিক। এভাবে আত্মঘাতী হওয়া —বিশেষ করে ধর্মের জন্য, তাঁদের চোখে একটা বিস্ময়কর ঘটনা মনে হত। তাই থেকে গল্প রটে যায় যে তাদের নেতা মোহাম্মদ কোনো মাদক খাইয়ে তাদের হানা দিতে পাঠান। 'আসিসিন কমানডো' কথাটি থেকে অ্যাসাসিন (যা বাঙলায় আততায়ী) কথাটি এভাবেই উদ্ভূত হয়। মুসলিম সম্পর্কে ব্যবহৃত 'ফ্যানাটিসিজমে'র এমন নমুনা প্রচুর।

এর পেছনে আরও একটা আরবি শব্দ 'হাসিস' জড়িত হয়ে যায়। আরবি 'হাসিস' মানে গবাদি পশুর খাদ্য এরকম ঘাস বা উদ্ভিদ (দ্রষ্টব্য : উইলিয়াম থেসিজার-এর মারশ আরবস, পেঙ্গুইন ১৯৭৮ পৃষ্ঠা ৪৫)। এইসব উদ্ভিদের মধ্যে মাদকশক্তিসম্পন্ন উদ্ভিদও আছে। যেমন আমাদের দেশের সিদ্ধি/গাঁজার গাছ (একই গাছে পুরুষ-প্রজাতি থেকে সিদ্ধি, স্ত্রী-প্রজাতি থেকে গাঁজা উৎপন্ন হয়)। সিদ্ধি প্রচুর জন্মায় বীরভূম-মুর্শিদাবাদের পোড়ো জায়গায় আগাছা হিসেবে। তেমনি আফিমগাছও জন্মায়। বর্ধমানের বড়শুলে যত্রতত্র আফিমগাছের জঙ্গল দেখেছি ১৯৫৭ সালে। যাই হোক, ইউরোপীয় 'হাসিস' শব্দটি অধুনা শুদ্ধ মাদক অর্থেই প্রযুক্ত হয়। এটি আরবি হাসিস-জাত। হাসিস আরবিতে ক্যাটল্‌-ফডার।

কিন্তু নিজারি ইসমাইলি জঙ্গিনেতার 'আসিসিন স্কোয়াড'-এর 'আসিসিন'-শব্দটি মূলত হিব্রু 'হাসিদিম'-এরই যমজ। তথাকথিত সেমিতিক-গোষ্ঠীর (বাইবেলোক্ত নোয়ার তিন পুত্রের অন্যতম সেম—যা থেকে 'সেমিতিক', 'সেমিতি', এসব শব্দের উদ্ভব এবং প্রয়োগ) প্রধান ভাষাত্রয় আরামীয়, হিব্রু এবং আরবি কতকটা আমাদের বাঙলা-অসমিয়া-ওড়িয়ার মতো সম্পর্কযুক্ত। হিব্রু ইহুদি 'হাসিদিম' শব্দের অর্থও ধর্মভীরু (দ্রষ্টব্য : দ্য ডেড সী স্ক্রোলস—জন অ্যালেগ্রো পেঙ্গুইন ১৯৭১ পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬)। ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক শাসক আন্তিওখাস এপিফেনিস যখন সাংস্কৃতিকভাবে অনগ্রসর ইহুদিদের ওপর হেলেনীয় ধর্মসংস্কৃতি চাপানোর চেষ্টা করেন, তখন ইহুদি মাক্কাবি গোত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরে তারা জয়ী হয়। কিন্তু যুদ্ধকালে অন্য একটি রক্ষণশীল ইহুদিগোত্র মাক্কাবি গোত্রের সঙ্গে যোগ তো দেয়ই নি, বরং তারা শয়ে শয়ে গ্রীক শত্রুদের সামনে গিয়ে নিরস্ত্রভাবে দাঁড়ায় এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়। গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগতত্ত্ব নতুন নয়। এই একটি ঐতিহাসিক নজির তার। এরা ছিল বৌদ্ধদের মতো অহিংসবাদী। মাক্কাবিরা তাদের বুঝিয়েসুঝিয়েও অস্ত্র ধরাতে পারে নি। এদেরই ইহুদি হিব্রু বাইবেলে 'ফার্স্ট বুক অব মাক্কাবিস' খণ্ডে 'হাসিদিম' অর্থাৎ ধর্মভীরু বলা হয়েছে। এই গোষ্ঠী থেকেই পরবর্তী কালে ফারিসি গোষ্ঠী এবং এসেনীয় গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে। এ প্রসঙ্গে যোশেফাসেস (৩৭ খ্রী—১০০ খ্রী) 'দ্য অ্যানটিকুইটিস অব দ্য জুস-এর ইংরেজি অনুবাদ (অনুবাদক উইলিয়ম হুইসটন প্রকাশক ম্যাসাচুসেটস পাব : ১৯৮০) দ্রষ্টব্য। যোশেফাস ছিলেন ফারিসি-বংশজাত। এসেনীয়দেরই লেখা বাইবেলের পাণ্ডুলিপি এবং বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে মরুসাগরসন্নিহিত কুমরান অঞ্চলে। চামড়ায় লেখা বাইবেল ও ধর্মীয় অনুশাসনসংক্রান্ত সেইসব আবিষ্কৃত কেতাবই 'ডেড সী স্ক্রোলস' নামে অভিহিত। তবে বিশেষ উল্লেখ্য হল আধুনিক গবেষকরা যিশু খ্রীষ্টকে ওই এসেনীয় গোষ্ঠীরই এক প্রবক্তা বলে সাব্যস্ত করেছেন। 'এসেন'—এই হিব্রু ও আরামীয় শব্দটি ধ্বনি- ও অর্থসাদৃশ্যে হাসিদিম-সম্পর্কিত। তবে যোগরূঢ়ার্থে যা বোঝায় তা বাঙলায় 'ওঝা' বলতে আমরা যা বুঝি, তার তুল্যমূল্য। যিশুর বহু ক্রিয়াকর্মে যেমন, তেমনি বাইবেলি অন্যান্য প্রফেটদের ক্রিয়াকলাপেও দ্বিতীয় অর্থটি প্রকাশ পেয়েছে বহুবার। যেমন মোজেসের (আরবিতে মুসা) লাঠিটির সাপ হয়ে ওঠা, কিংবা সমুদ্র দুভাগ করা ইত্যাদি। আব্রাহামের (আরবি ইব্রাহিম) কাহিনীতেও দৃষ্টান্ত আছে। যাই হোক, সে অন্য প্রসঙ্গ।

এতসব কথা বলার কারণ হাসিদিম/এসেন/আসিসিন-এর ঐতিহাসিক এবং ইটিমলজি-সংক্রান্ত সম্পর্কের ব্যাখ্যা। ইউরোপীয়রা মধ্যযুগে 'আসিসিন স্কোয়াড'-এর কাণ্ড দেখে মাদকসংক্রান্ত গল্পটি বানিয়ে নিয়েছেন এবং আরবি শব্দ 'হাসিস' এবং হিব্রু-আরামীয় এসেন বা ওঝা তাতে উপাদান যুগিয়েছে। তাই মাদক বোঝাতে হাসিস এবং আততায়ী বোঝাতে অ্যাসাসিন চালু হয়ে গেছে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানসমাজ তথা ইউরোপীয় ভাষায়।

আমরা ভারতের 'খোজা ইসমাইলি' সম্প্রদায়ের কথা জানি, যাঁদের ধর্মগুরু আগা খাঁ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী বলে গণ্য ছিলেন কিছুকাল আগে। আগা খাঁ এবং তাঁর পূর্বপুরুষরাই দাবি করেছেন, তাঁরা পূর্বোক্ত নিজারি ইসমাইলিদের বংশধর, অর্থাৎ স্বয়ং নিজার মোহাম্মদ ইসমাইলের

অর্থাৎ তথাকথিত 'পর্বতবাসী বৃদ্ধের' বংশধর।

ভবানীবাবু এ বিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাও দেখে নিলে আরও বিস্তর তথ্য পেয়ে যাবেন। আসিসিন থেকে অ্যাসাসিন-এর উদ্ভব ভাষার ইতিহাসে যবনের মতই স্বাভাবিক। ভবানীবাবু নিজারি ইসমাইল প্রসঙ্গে ম্যালাইজ রুথভেন-কৃত 'ইসলাম ইন দা ওয়ার্ল্ড' বইটিও দেখে নিতে পারেন। এটি পেপারব্যাকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

BENGAL IMMUNITY
IN THE SERVICE OF THE NATION SINCE 1919

Manufacturers of :

* **TRANSFUSION FLUIDS**
* **SERA**
* **TOXOIDS**
* **VACCINES**
* **ANTIBIOTICS**
* **ANTIMALARIALS**
* **AMOEBICIDES**
* **VITAMINS**

AND A WIDE RANGE OF OTHER SPECIALITIES

Bengal Immunity's 80 ton per annum Chloroquine Phosphate Plant is the largest of its kind in Asia

BENGAL IMMUNITY LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
153 Lenin Saranee, Calcutta-700013